প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ভারতী লাইব্রেরী
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৫

প্রকাশক
এ. সাহা
ভারতী লাইব্রেরী
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী—আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রসার কল্পে—ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থের স্থলভ মূল্য সম্ভব হইয়াছে।

সূচী

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি বলিলে আমরা বুঝি প্রাচীন ভারতে আর্য ও আর্যেতর জাতির অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য। যে শিক্ষাদীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি, সভ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-সাহিত্যের ধারা এবং ধর্ম, আচার ও অনুষ্ঠানের অবদান তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে তাহাই তাহাদের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি আছে বলিয়াই আর্য যাহা ভাবিয়াছে, আর্যেতর কোন জাতিও হয়তো সেই একই ভাবনা করিয়াছে, আর্যের সমস্যা হয়তো আর্যেতর সমস্যার সঙ্গে অনেকাংশে মিলিতে পারে, তাহার সমাধানেও হয়তো অদ্বিতীয়ত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু উভয়ের চিন্তার ধারা এবং সমাধানের ধারায় অপূর্বত্বই থাকিবেই। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি বুঝিতে হইলে পুরাতন ভারতের প্রকৃতির সন্ধান প্রথমেই লইতে হইবে।

আর্য ও আর্যেতর জাতি লইয়াই প্রাচীন ভারত। ভারতবর্ষে আর্যদের কেমন করিয়া প্রথমে দেখা পাওয়া গেল সে সমস্যার সমাধান আজও ভাল করিয়া হয় নাই। ভাষাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ প্রভৃতির সাহায্যে অনেক দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত বিপুল পরিশ্রম করিয়া আর্যদের আদি নিবাস স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ওটো শ্রাডের (Otto Schrader) স্থির করিলেন দক্ষিণ রাশিয়া, জেয়ঁা দে মরগ্যান (J. de Morgan) দেখাইলেন সাইবেরিয়া, ডঃ গাইলস (Dr. Giles) প্রমাণ করিলেন আর্যদের আদি নিবাসের পূর্ব সীমান্ত কার্পেথিয়ান, দক্ষিণ সীমা বলকান, পশ্চিম সীমা অস্ট্রিয়ান আলপস এবং উত্তর সীমা Erzgebirge। এইরূপ কেহ দেখাইলেন এশিয়া মাইনর, কেহ বা বলিলেন ভারতবর্ষ। আর্যরা যে বাহির হইতে আসিয়াছেন এই মত প্রায় সকলেই একরূপ

নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন। মানিয়া লইবার পক্ষে বা বিরুদ্ধে যেঁ সব যুক্তি আছে, সেগুলি বড়ই ফাঁকা—চূড়ান্ত তো নয়ই।

ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্তগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যে যথেষ্ট তাহা অস্বীকার করা চলে না। আর্যদের যে একটা প্রাচীন আবাসস্থল ছিল ইহারই দুই এক জায়গায় তাহার একটু ইঙ্গিত আছে। তাঁহাদের সেই প্রাচীন নিবাসভূমি—বেদের "প্রত্ন ওকঃ" ভারতের ভিতরে কি বাহিরে তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। তাঁহারা যে বাহির হইতে আসিয়াছিলেন তাহার একটিও প্রমাণ বেদে নাই। বরং কতিপয় আর্যেতর জাতিকে তাঁহারা ভারতের বাহিরে পশ্চিম দিকে বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে আছে (৭.৫.৬)। যাহা হউক আর্যরা ভারতবাসী হউন অথবা বাহির হইতেই আসুন তাহাদের সংস্কৃতি বা culture সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়াছিল। ঋগ্বেদ যে শুধু আর্য-সংস্কৃতির ক্রমপরিণতির ইতিবৃত্ত নির্ণয়ে সহায়তা করে তাহা নহে, এগুলি থেকে আমরা সেই সময়ের আর্য-অধ্যুষিত স্থানাদি সম্বন্ধেও অনেক সন্ধান পাইতে পারি। ইহাতে কতকগুলি স্থানের ভৌগোলিক বর্ণনাও পাওয়া যায়। এই সকল বর্ণনা রাবি নদের তীর প্রদেশকে নির্দেশ করে। রাবির তীর হইতে পঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে কেন্দ্র করিয়া যে আর্য সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। কয়েক বর্ষ পূর্বে সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে 'মোহেঞ্জোদড়ো'কে কেন্দ্র করিয়া ধ্বংসস্তূপ হইতে যে সমস্ত প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার হইয়াছে সেগুলি ঋগ্বেদের সূক্ত সকলের উক্তিরই প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি অন্তত খ্রী-পূ° ৩০০০ বর্ষ পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার সাক্ষ্য দেয়। এই আবিষ্কারগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন পরিচয় কিনা সে সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছে। মোহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি স্থানে ভূগর্ভ খননে যে সমস্ত মন্দির ও অট্টালিকার উদ্ধার হইয়াছে বিশেষজ্ঞের মতে সেগুলি শুধু একটি যুগের সাক্ষ্য দেয় না, ভূগর্ভের

বিভিন্ন স্তরের সঞ্চিত বিভিন্ন যুগের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের পরিচয় দিয়া থাকে। বিশেষত এইগুলি যে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিরই পরিচায়ক সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ একমত প্রকাশ করিয়াছেন। মোহেঞ্জোদড়োর মন্দিরগুলির সঙ্গে পরবর্তীকালের দ্রবিড় পদ্ধতির মন্দিরগুলির বাহুল্য আছে। সুল্ব ও বৈখানস সূত্রানুযায়ী যজ্ঞবেদীর আদর্শে কল্পিত মন্দিরের অনুযায়ী হরপ্পার একটি মন্দিরও রহিয়াছে। এ ছাড়া ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত বিভিন্ন দ্রব্যগুলি ভারতীয় ইতিবৃত্তের অনেক উপকরণ যোগাইয়াছে।

আবিষ্কৃত মন্দিরগুলি হইতে অনেকগুলি চক্রাকার প্রস্তর, বিভিন্ন প্রকার দাবার ঘুঁটি, বিভিন্ন জন্তুর মূর্তি, ক্ষোদিত ফলকাদি, আসবাব-পত্র, অলঙ্কার, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রপাত্রাদিও পাওয়া গিয়াছে। এই গুলির সঙ্গে ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ বর্ণিত দ্রব্যাদির সাদৃশ্য আছে। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে তাম্রযুগের নিদর্শন বলিয়া নির্দেশ করেন। মন্দিরগুলিতে কূপ ও স্নানাগার প্রভৃতির সুন্দর বন্দোবস্ত রহিয়াছে। আবিষ্কৃত এই মন্দিরগুলি তখনকার সভ্যতার সুন্দর চিত্র। ঋগ্বেদে আর্য ও দস্যুগণের প্রাসাদগুলির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে মোহেঞ্জোদড়োর মন্দিরগুলির সাদৃশ্য বড় কম নয়।

এই সকল স্থানে অনেকগুলি প্রতিমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি আর্য ও দ্রবিড় সভ্যতার নিদর্শন। ডঃ হলের ধারণা সুমেরীয় পূর্ব (pre-sumerian) প্রভাব ভারতীয় মৃৎশিল্পে পড়িয়াছিল। কিন্তু এ ধারণা অমূলক। আবিষ্কৃত মৃৎশিল্পের নিদর্শন ও মূর্তি ক্ষোদিত ফলকগুলিতে আর্য ও দ্রবিড় চিহ্নই বর্তমান।

তদানীন্তন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ব্যাবিলন ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরস্থ অনেক প্রদেশের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের মধ্যেও আর্য দ্রবিড় সম্বন্ধও রহিয়াছে।

আর্য ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে দ্রবিড়

জাতির দান বড় কম নয়। প্রাচীন দ্রবিড়-সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে আর্যভাব শূন্য। আর্যদের সঙ্গে ইহাদের সমাজ গঠনেরও পার্থক্য রহিয়াছে। দ্রবিড়-সমাজে মাতৃপক্ষ হইতে পরিবার গঠিত, আর্য-সমাজে কিন্তু পিতৃপক্ষ হইতে পরিবার গঠন। তথাকথিত "অসুর" সমাজের সঙ্গে দ্রবিড়-সমাজ গঠনের অনেকটা মিল আছে। আর্যগণ যাহাকে ময়-অসুর বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন সেই ময়ই দ্রবিড়-সভ্যতার বিজ্ঞান সাধনার চরম সাক্ষ্য দান করিতেছে। পূর্ত ও স্থপতিবিদ্যার আর্য আদর্শ বিশ্বকর্মা, দ্রবিড় আদর্শ ময় দানব।

সুমেরীয়, কাল্ডীয়, ঈজীয় ও মিশরীয় জাতির সভ্যতার উপরও দ্রবিড়-সভ্যতার প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। দ্রবিড় জাতি নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। দ্রবিড় ভাষায় তাহার পরিচয় রহিয়াছে। সংস্কৃত নৌ সম্বন্ধীয় শব্দাবলী দ্রবিড় ভাষা হইতেই গৃহীত। এই দ্রবিড় জাতি যে বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণও নাই। অতি প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষ ও মেসোপটেমিয়ায় যোগাযোগ ছিল ২১০০ খ্রী-পূ°-র একখানি ফলক ও অন্যান্য নিদর্শন হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। কয়েক বৎসর হইল প্রত্নানুসন্ধানে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ছয়জনকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে ভারতের বাহিরে অতিদূর দেশে। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্য, সূর্য ও মরুৎ—এই ছয়জন দেবতার উল্লেখ আছে বোগাস কুই শিলালেখে, তেক-এল-অমরনার পত্রাবলীতে এবং ব্যাবিলনের 'কাসাইটদের রেকর্ডসে।' মিটানি রাজ্যের সহিত আসিরীয় রাজ্যের যে যুদ্ধ ব্যাপার তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। Tel-el-Amarna হইতে Tusratta যে পত্রগুলি মিশরের তৃতীয় Amenhotopকে লিখিয়াছিলেন সেগুলি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির সময় Boghas Kui লিপির সময়ের অনুরূপ। এই পত্রগুলিতে উত্তর পশ্চিম মেসোপটেমিয়ার মিটানি জাতির উল্লেখ আছে। এখানে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন তাহাদের

কাহারও কাহারও নামও পাওয়া যায়। এই রাজাদের মধ্যে তুস্রত্ত, অর্ততম, সুত্তর্ণ, অর্তসুমর প্রভৃতি ইন্দ্র, মিত্র বরুণ ও নাসত্যের পূজা করিতেন। এগুলি যে আর্য নাম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তারপর পাঁচশত বৎসর কাশীয় জাতি (১৭৪৬-১১৮০ খ্রী-পূ°) মিডিয়া হইতে গিয়া সমগ্র বাবিলন অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরও রাজাদের এবং দেবতাদের নাম আর্য-নাম। ইঁহাদের Shurias ও Marytas সূর্য ও মরুৎ। Simalia আর্যদের হিমালয়। দেখা যাইতেছে কাসাইটরা হিমালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মিটানির সহিত আর্যদের সম্পর্ক ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পূর্বে এই পুরাতন ভ্রান্ত ধারণা আর টিকিতে পারে না। আর্যদের ধর্ম পারস্যের মধ্য দিয়া এসিয়া মাইনরে যায় নাই। ভারত হইতেই আর্যধর্ম বরাবর এসিয়া মাইনরে গিয়াছে। এই অভিগমনে পারস্যের মধ্যস্থতার কোন প্রয়োজনও হয় নাই। যদি হইত তাহা হইলে এই দেবতাদের নামগুলিতে পারস্যদের ভাষার অন্তত একটু ছিটেফোঁটাও থাকিত। পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে অমরনার পত্রাবলীতে দেবতাদের নামগুলি আদৌ ম্লেচ্ছিত হয় নাই। সেগুলিতে ভারতীয় রূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পারস্য মধ্যস্থ থাকিলে খ্রী-পূ° ১৪শ শতকে এমন কি ১৭৬০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দেও Tusratta ও Sutarna প্রভৃতি শব্দগুলিকে অম্লেচ্ছিত রূপে দেখিতে পাইতাম না। বোগাস কুই-লিপিতে যে সমস্ত সংখ্যাবাচক নামের উল্লেখ আছে তাহাদের সহিত বৈদিক সংখ্যা নামের সাক্ষাৎ সাদৃশ্য আছে। এ ছাড়া বৈদিক শব্দের সহিত কয়েকটি শব্দেরও বেশ মিল আছে। এই সুদূর প্রদেশে আর্য দেবতারা শান্তির ভাবই প্রকটিত করিয়াছেন। আর শান্তির এই বাণী লইয়াই ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়।

ইরাণী জাতিও সম্ভবত ভারত হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়াছিল। ইহারাও বেদবর্ণিত অসুর জাতির সমপর্যায়। বেদ ও অবেস্তার

আলোচনায় ঋগ্বেদকেই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বেদের অনেক আখ্যানের সঙ্গে অবেস্তার আখ্যানের সাদৃশ্য আছে। তাহাদের ক্ষৌরকর্মের প্রণালী, পরিধেয়ের পদ্ধতি, তাহাদের জয়ধ্বনি-সূচক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আর্যদের অনেক মিল আছে। যণ্ড, মর্ক, বেরেত্রয়, ত্রেতন অথেব্য বেদের যণ্ড, মর্ক, বৃত্রঘ্ন, ত্রিতআপ্ত্য। বেদপন্থী ও অবেস্তাপন্থীদের পূর্বপুরুষগণ পূর্বে একসঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহারা যেখানে থাকিতেন, তাহাকে তাঁহারা 'স্বর্গ' বলিতেন। বেদপন্থীদের পূর্বপুরুষগণ আপনাদিগকে 'দেব' বলিতেন ও অন্যদলকে "অসুর" নামে পরিচিত করিতেন। তখন দেব ও অসুর 'ঈশ্বর' Lord অর্থেই প্রযুক্ত হইত। দেব ও অসুরদের পরস্পর বেশ মিল ছিল। তাহারা পরস্পর ভ্রাতৃব্য বলিয়া বুঝিতেন। সহোদর ভ্রাতা না হইলে তখন 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া পরিচয় দিবার প্রথা ছিল। এখন যেমন পিতৃব্য বলিলে বাপ না বুঝাইয়া খুড়া, জেঠা বুঝায়, তখন তেমনই ভ্রাতৃব্য বলিলে সহোদর ভ্রাতা না বুঝাইয়া অপর সকলকে বুঝাইত। ক্রমে উভয়দলের ধর্মমতের পার্থক্য ঘটিল। ভৃগু অগ্নিপূজার প্রবর্তন করিলেন। দেবগণ যজ্ঞ করিতে সুরু করিলেন। প্রথম প্রথম অসুররাও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা যজ্ঞে রাজি হইলেন না। শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, দেব বলিলে যজ্ঞকারী মাত্রই বুঝাইত। শতপথ-ব্রাহ্মণ তাই দেবের সংজ্ঞা দিয়েছেন—'যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ' (১.৫.৫.২৬)। অসুরা সারা বৈদিক সাহিত্যে স্বর্গবাসী। প্রথম প্রথম 'অসুর' শব্দ বৈদিকযুগে দেবতাদের নিকট খুব শ্রদ্ধাবাচক, মর্যাদাব্যঞ্জক ছিল। বৈদিকযুগের গোড়ার দিকে যাঁহারা খুব বড় হইতেন, তাঁহারা 'অসুর' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। মরুৎ, দ্যৌ, বরুণ, ত্বষ্টা, অগ্নি, বায়ু, পুষ্প, সবিতা, পর্জন্য —ইঁহারা সকলেই বেদে সম্মানসূচক 'অসুর' পদবাচ্য ছিলেন। ইঁহাদের অলৌকিক শক্তি ছিল বলিয়া ইঁহাদিগকে বৈদিক ঋষিরা অসুর বলিতেন।

বেদে ১০৫ বার অসুর শব্দ আছে, সবই ভাল অর্থে প্রযুক্ত কেবল ১৫ বার দুষ্ট অর্থে প্রযুক্ত। যতদিন দেব ও অসুরের মিল ছিল, ততদিন 'অসুর' বলিলে মর্যাদা, প্রভাব বুঝাইত। কিন্তু যখন মনের অমিল হইত লাগিল, তখন উভয়ে উভয়ের প্রতি আকর্ষণ ভুলিয়া গেলেন। উভয় দলে বেশ শত্রুতাও চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম এক একজন অসুরের সঙ্গে এক একজন দেবতার যুদ্ধ হইত। শেষে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একদল অপর দলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে গোড়ায় অসুররা দেবতাদের জ্বালাইয়া মারিত। শেষে দেবতারা বহু কষ্টে ছলে কৌশলে জয়ী হইলেন। এ সম্পর্কে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের উদাহরণ খুব প্রসিদ্ধ। যুদ্ধের সময় দেব ও অসুর উভয়েই ইন্দ্রকে পাইবার জন্য, তাঁহার সাহায্যের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে ইন্দ্র সম্পর্কে (১. ৭. ১০) দেবতারা বলিয়া ছেন—"অস্মাকংস্তু কেবলঃ।" অসুরদের বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার জন্য ইন্দ্রকে তাঁহারা বার বার ডাকিয়াছেন (৮. ৮৫. ৯)।

অগ্নি তাঁহাদের ভরসা দিয়াছিলেন যে, অসুরদের বিধ্বস্ত করিবার জন্য তিনি মন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিবেন (১০. ৫৩. ৪)। অসুরদের বড় বড় বীর ছিল। পিপ্রু অসুরের, শম্বর অসুরের অনেকগুলি দুর্গ ছিল। শম্বরের ছিল অন্তত ৯০টি (১. ১৩০. ৭) কিংবা ৯৯টি (২. ১৯. ৬)। বর্চী অসুরের লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা ছিল। নিজেও তিনি খুব দুর্দান্ত। দেবতাদের অনেক সময় এই সব দুর্দান্ত অসুরদের উপর নির্ভর করিতে হইত (১০. ১৫১. ৩)। যখন যুদ্ধ বাধিত ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য দেবতার হইয়া যুদ্ধ করিতেন। ইন্দ্র অসুর পিপ্রুর কেল্লা নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন (১০. ১৩৮. ৩)। ইন্দ্র বিষ্ণু অসুর বর্চীর লক্ষ বীরকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন (৭. ৯৯. ৫)। অসুরদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইন্দ্র (৬. ২২. ৪), অগ্নি (৭. ১৩. ১) ও সূর্যের (১০. ১৭০. ২) নাম হইয়াছিল 'অসুরহা'। রুদ্র ছিলেন নিজে মহা অসুর (৫. ৪২. ১১), 'অসুররা' তাঁহার ভক্ত ছিল। দেবাসুরের যুদ্ধের

পর হইতে যখন দেবতারা অসুরদের একেবারে হটাইয়া দিলেন (১০. ১৫৭. ৪) তখন দেবতারা অসুরদের শত্রু বলিয়া উল্লেখ করিতেন, তাঁহাদের 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন।

মানুষের পারিবারিক জীবনকে অবলম্বন করিয়া এবং তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া মানুষের জীবন গড়িয়া উঠে। বৈদিক যুগেও তাহাই ঘটিয়াছে। বৈদিকযুগে বানপ্রস্থীরাও ছিলেন। তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গৃহীদিগের পারিবারিক জীবনে পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করা। তাঁহারা কঠোরতার দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে পোষণ করিতে চাহিতেন না। পবিত্রতার দ্বারা ইন্দ্রিয়নিচয়কে জয় করা তাঁহারা ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। সমাজ-জীবনের ধারা রুদ্ধ করা ভারতীয় সন্ন্যাসের আদর্শ ছিল না। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ককে পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ভারতীয় সমাজ অগ্রসর হইয়াছে। বৈদিক সমাজে পারিবারিক জীবনে প্রথমেও ব্যক্তিত্বকে সমষ্টির মধ্যে সমর্পণ করিতে হয়। বৈদিক সমাজে স্বগোত্র ও অসবর্ণ বিচারের পদ্ধতি এমনভাবে নির্দিষ্ট ছিল যাহাতে শারীরিক অস্বাস্থ্যের পথও রুদ্ধ হইয়াছিল, অথচ তাহাকে স্বাজাত্য সংস্কৃতির কোন হানির সম্ভাবনা ছিল না। নিয়োগ পদ্ধতি (hypergamy) দ্বারাও নীচবর্ণে আর্য-সংস্কৃতির প্রসার সহজসাধ্য হইয়াছিল। এই নীচবর্ণের রক্তধারাও পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

পারিবারিক জীবনের উচ্চ আদর্শ ধারাবাহিকভাবে বংশপরম্পরার প্রভাব বিস্তার করিত। ভারতীয় পরিবার জীবন প্রথম হইতে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বৈদিক রাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণভাবে পরিবার-জীবনই রাষ্ট্রের ভিত্তি। কুল-ধর্ম রক্ষাই ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম। তাই রাষ্ট্রধর্ম অপেক্ষা কুল-ধর্মের স্থান ছিল উচ্চে। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া কোন নাম বা সংজ্ঞা ছিল না। এক একটি বংশ যেমন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, অমনি বিপুলভাবে বর্ধমান সেই সেই বংশের শাসনভার সেই তাবদ্

বিস্তৃত বংশ নিজেই গ্রহণ করিল। ইহা হইতে ক্রমশ স্ব-শাসক (self-governing) জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তাই মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ কুলধর্মের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। এই প্রথা সম্পুর্ণ ভারতীয়। দক্ষিণ ভারতে তামিল প্রদেশে এইরূপ নীতি বর্তমান থাকায় কেহ কেহ ইহা দ্রবিড়-প্রভাব বশতঃই মনে করিয়া থাকেন।

বৈদিক সমাজের সুদূর নীতি ছিল—সত্য ও ঋত। ধর্মে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ বদ্ধ অথচ স্বধর্মে প্রত্যেকে স্বাধীন। সমাজের সমষ্টিগত ধর্ম—সনাতন ধর্ম। ইহার ব্যক্তিগত ধর্মই—স্বধর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্মে এই উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তির অনুসন্ধান করিতে হইলে বৈদিকযুগের সমাজের সম্যক্ আলোচনা প্রয়োজন।

এই সমাজ গঠনে আর্য বা দ্রবিড় বলিয়া কোন কথা নাই। আর্য-সভ্যতা বিস্তারে আর্য ও অনার্য সংমিশ্রণে আর্যজাতির নিকট এক সমস্যা উপস্থিত হয়। সেই সমস্যার সমাধানে আর্যগণকে স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। ফলে তখনকার বিভিন্ন জাতি সমষ্টির উপর আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব বা ধারা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এইরূপ সমাজ সংগঠিত হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম—বৈদিক আর্য জীবনের ছিল আদর্শ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বিভাগে পরস্পর উচ্চনীচ ভেদ ছিল না, ইহা শুধু বর্ণানুযায়ী বিভাগ। উচ্চ তিন বর্ণের কর্ম পরিচালনার জন্য নিয়ম প্রণয়নও ধীরে ধীরে হইয়াছিল। আর্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য এই সকল নিয়মে কঠোরতাও যথেষ্ট ছিল। কেহ কর্তব্যে অবহেলা করিলে তাহাকে স্বধর্মত্যাগী বলিয়া নিন্দনীয় হইতে হইত।

পরবর্তীকালে ধর্মবিভাগ জাতিবিভাগে রূপান্তরিত হয়। ধর্মরক্ষাই ছিল রাজধর্ম। বর্ণ ও আশ্রমের রক্ষার ভার ছিল রাজার উপর। ইউরোপে রাজ্য (state) রক্ষা রাজধর্ম ভারতের ধর্ম রক্ষাই

রাজধর্ম। রাজাও ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে পূজিত হইতেন। ধর্ম-ত্যাগী রাজার সিংহাসন চ্যুতিরও সম্ভাবনা ছিল। আবার বর্ণ প্রতিনিধি বর্ণের সহায়তাও কর্তব্যনির্ণয়েরও দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ সমষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষণ। রাষ্ট্রক্ষেত্রেও তাহা দেখা যায়। ভারতে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্য থাকিলেও পরস্পর সংস্কৃতিগত যোগ ছিল। সাম্রাজ্য স্থাপনেও সেই আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে অশোক, হর্ষ প্রভৃতির সময়েও প্রত্যেক রাষ্ট্র স্ব-স্ব অধীন ছিল।

বৈদিকযুগে যজ্ঞ-প্রথা

ভারতীয় আর্যরা যজ্ঞ করিতেন। স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। তাঁহাদের যজ্ঞ ছিল তিন রকমের। প্রথমত বেদিতে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাতে তাঁহারা দুগ্ধ, নবনীত ও শস্য আহুতি দিতেন; এবং দ্বিতীয়ত তাঁহারা পশুবলি দিতেন, এবং তৃতীয়ত তাঁহারা যজ্ঞীয় তৃণের উপর এক রকম ন্যুব্জাকৃতি পাত্রে সোম ঢালিতেন। যজমান যিনি যজ্ঞ করিতেন তিনি তাঁহার গৃহে পুরোহিতদের নিমন্ত্রণ করিতেন। যজ্ঞস্থলে দেবতাদের অবতরণের জন্য নানা প্রকারে স্তুতি করা হইত। স্বর্গ হইতে বায়ুরথে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে যজ্ঞভূমিতে অবতরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইত। দেবতারা এইরূপে অবতরণ করিয়া, যজমানের পত্নী ও পুরোহিতগণের সহিত বসিয়া পান ভোজন করিবার জন্য যজমান তাঁহাদিগকে আবাহনও করিতেন। ঋগ্বেদের প্রথম দিক্‌কার সময়ে এই সমস্ত অনুষ্ঠান হইত। যে সময় প্রাচীন আর্যগণ ভারতের উত্তর পশ্চিম কোণ অধিকার করিয়াছিলেন; তখন তাঁহারা সিন্ধুনদের উপরের প্রদেশই আপনাদের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছিলেন। সুতরাং সেই সময়ে কাবুল নদের উপত্যকা, সোয়াট নদী, কুরম, গোমল প্রভৃতির উপর তাঁহাদের স্বামিত্ব ছিল। ঋগ্বেদের শেষের দিকের সময় আর্য-সভ্যতা যমুনা ও গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন আর্যরা নর্মদা বা বিন্ধ্যপর্বত জানিতেন না, ঋগ্বেদে তাহাদের উল্লেখও নাই। কিন্তু সমস্ত বৈদিক যুগের মধ্যে আর্য-সভ্যতা সমস্ত হিন্দুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণে ও বিন্ধ্যগিরির উত্তরে সমস্ত দেশ আর্য-সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। যে সময় আর্য-সভ্যতার কেন্দ্র গঙ্গার উপত্যকায় ছিল যজুর্বেদে সেই সময়েরই দ্যোতনা

পাওয়া যায়। যজুর্বেদের সময় চারিবর্ণ তো দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছিলই, অধিকন্তু পরবর্তী যুগে যে সমস্ত মিশ্র জাতির নাম পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই উল্লেখ যজুর্বেদে আছে।

এই সময়ে যজ্ঞ ছিল একটা সাধারণ ব্যাপার। যজ্ঞ না করিলে প্রত্যবায় ছিল। বেদি নির্মাণ করিয়া যজ্ঞ করিতে হইত। বেদিও ছিল অনেক প্রকার।

অগ্নির সহিত সকল বেদি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। বৈদিক ভারতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান সকল সময়ই হইত। বৈদিক যজ্ঞেও তিন প্রকার অগ্নির কথা জানিতে পারা যায়। এই তিন অগ্নির নাম গার্হপত্যাগ্নি, আহবনীয়াগ্নি ও দক্ষিণাগ্নি। বৈদিক সাহিত্যে তিন অগ্নির যথেষ্ট আলোচনা আছে। এই তিন অগ্নির আকার গার্হপত্যাগ্নি=চতুষ্কোণ কুণ্ড। আহবনীয় অগ্নি=ত্রিকোণকুণ্ড* দক্ষিণাগ্নি=বর্তুলকুণ্ড। ইহাদের প্রতিকৃতি এইরূপ—
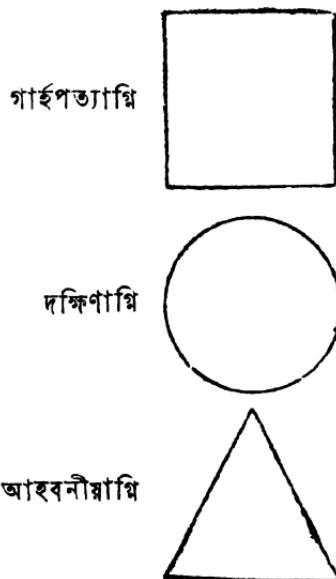
* রাসায়নিক চিহ্নের সমস্ত তালিকায় সমত্রিকোণ (equilateral

এই তিন অগ্নির সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ। লোকে এই তিন অগ্নি রাখিত। ক্রমশ প্রাচীন বৈদিক ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন ঋষিরা অগ্নি প্রজ্বলিত না রাখিয়া তাহা নিবাইয়াই রাখিতেন। সে সময় তাঁহারা অগ্নির আরাধনার জন্য কোনই অনুষ্ঠান করিতেন না। তবে তাঁহারা সযত্নে বেদি রক্ষা করিতেন।—ঋগ্বেদ, ১.১৩৬.৩।

বৈদিক যুগে দুই শ্রেণীর যজ্ঞের প্রচলন ছিল। যে যজ্ঞ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত এবং পুরোডাশ, পিষ্টক প্রভৃতি আহুতি দিয়া সম্পন্ন হইত, তাহার নাম হবির্যজ্ঞ; আর যে যজ্ঞ সোমরস আহুতি দিয়া সম্পন্ন হইত তাহার নাম "সোমযজ্ঞ" বা 'সোমযাগ।' [সোমযাগ ভারতবর্ষে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সোমযাগের আরম্ভ ভারতবর্ষে হয় নাই। এই যাগটি ভারতবর্ষের পক্ষে বৈদেশিক অনুষ্ঠান। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও আছে। একটি বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে সোমলতা ভারতের দ্রব্য নয়। গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলের দূরবর্তী পর্বতে সোমলতা উৎপন্ন হইত। আজকাল যেমন শুষ্ক করিয়া চরস সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, পূর্বকালে কিঞ্চিৎ আয়াস সহকারে ঐ সকল অঞ্চল হইতে সোমলতা সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিতে হইত। কিছুকাল পরে ভারতীয় আর্যগণ

triangle) দ্বারা অগ্নি বোঝান হইয়া থাকে। শত বৎসর পূর্বে বিলাতী মতের চিকিৎসকেরা সমত্রিকোণ চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। এই পুরাতন পদ্ধতি এখনও লোপ পায় নাই। অগ্নিজ্ঞাপক এই ত্রিকোণের চূড়াগ্র উপরের দিকে থাকে। অগ্নি বুঝাইতে হইলে মিশরেও ঠিক এইরূপ ত্রিকোণ প্রতীক (symbol) ব্যবহৃত হইত। অগ্নিশিখা উপরের দিকে উঠিয়া এইরূপ ত্রিকোণাকার ধারণ করে বলিয়া ত্রিকোণের চূড়াগ্র (apex) উপরের দিকে করিবার নিয়ম। জল কিন্তু নিম্নগামী বলিয়া নীচের দিকে যায়। নীচের দিকে ইহার গতি বুঝাইবার জন্য জল-দ্যোতক ত্রিকোণের চূড়াগ্র নীচের দিকে থাকে।

সোমলতা কিরূপ তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন; শেষে এমন কি সোমলতার পরিবর্তে অন্য একপ্রকার লতা সোম নামে ব্যবহৃত হইত। সোমলতা যে পারস্য, গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলের পর্বতীয় স্থানে জন্মিত, এখানে পাওয়া যাইত না, বেদ মন্ত্রেই তাহা উল্লিখিত আছে। বিশেষজ্ঞের অনুমান, প্রাচীনকালে পারস্যদেশে সোমযাগের প্রাদুর্ভাব হয়। সে যাহাই হউক, অতটা স্বীকার না করিলেও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সোমযাগ খাঁটি ভারতীয় নয়।] যজ্ঞশেষে সোম পান করা হইত। কৃষ্ণযজুর্বেদে যজ্ঞের নাম ও সৃষ্টির কথা জানিতে পারা যায়; 'প্রজাপতির্যজ্ঞানসৃজত। অগ্নিহোত্রং অগ্নিষ্টোমঞ্চ পৌর্ণমাসীঞ্চোক্‌থঞ্চামাবাস্যঞ্চাতিরাত্রম্'—কৃষ্ণ-যজুঃ ১.৬.৯। অথর্ববেদের গোপথ-ব্রাহ্মণ (পূ° ১.২৮, উ° ৩.২ ইঃ) হইতে জানিতে পারা যায়, ভৃগু ও অঙ্গিরা ঋষিই প্রথমে সোমযাগ প্রচলন করেন।

সোমযজ্ঞ প্রধানত সাত প্রকারের। অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম। এগুলি ব্রাহ্মণ দিগের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত। এতদ্ভিন্ন রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞও সোমযজ্ঞের মধ্যে পরিগণিত হইত। কিন্তু এই দুইটি ব্রাহ্মণেরা করিতেন না। সোমযাগের নানা শ্রেণী থাকা সত্ত্বেও অগ্নিষ্টোমকেই সকলের প্রকৃতিস্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়, কারণ এই শ্রেণীর যজ্ঞসমূহের সকল অনুষ্ঠানই সোমযজ্ঞের করণীয়।

এই যজ্ঞ বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হইত, কারণ ঐ সময় প্রচুর সোম পাওয়া যাইত। 'বসন্তেঽগ্নিষ্টোমঃ' (কাত্যায়ন শ্রৌত্র-সূত্র, ৭. ১. ৫)। ইহার অপর একটি নাম জ্যোতিষ্টোম—'বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত' (আপ° শ্রৌ-সূ° ১০.২৫)।

সোমযজ্ঞ তিন প্রকারের—'অহীন', 'সত্র,' ও 'একাহ'। যাহা একদিনে অনুষ্ঠিত হইত তাহার নাম 'একাহ'; ২ হইতে ১২ দিন ব্যাপী যে যজ্ঞ হইত তাহার নাই 'অহীন', আর এক পক্ষ কি বহুকাল-

ব্যাপী হইলে সেই যজ্ঞের নাম হইত 'সত্র'। সত্র আবার 'দীর্ঘ সত্র' ইত্যাদি বহু প্রকারের ছিল।

'এষ বৈ যজ্ঞঃ স্বর্গ্যো যদগ্নিষ্টোমঃ'—তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণ, ৪. ২. ১১। স্বর্গকামনায় অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠিত হইত। ইহা সর্বাপেক্ষা সহজ ও সাধারণ সোমযাগ। এই যাগে একটিমাত্র পশুবলি হইয়া থাকে। অগ্নিকে একটি মাত্র ছাগ আহুতি দিতে হয়। এই যাগে বারটি স্তোত্র গীত হইয়া থাকে। 'দ্বাদশাগ্নিষ্টোমস্য স্তোত্রাণি'—তৈ-ব্রা° ১. ২. ২. ১ ; তা-ব্রা° ৪. ২. ১২।—একটি বহিস্পবমান-স্তোত্র[১]। প্রাতঃসবনে চারিটি আজ্যস্তোত্র[২], মধ্যাহ্নসবনে মাধ্যান্দিনপবমান[৩] এবং চারিটি পৃষ্ঠ্যস্তোত্র[৪]। সায়ংসবনো ত্রিত্য (বা আর্ভব)-

---

১ সামগানসমূহের উত্তরাগ্রন্থে তৃচাত্মক সূত্রগুলি আম্নাত হইয়াছে।—সাম° উ° ১. ১. ১-৯। সূক্তগুলির প্রথম সূক্ত 'উপাস্মৈ'। 'দবি দ্যুতত্যা'—দ্বিতীয় এবং 'পবমানস্য তে'—তৃতীয় সূক্ত। জ্যোতিষ্টোমের প্রাতঃ-সবনানুষ্ঠানে এই তিনটি সূক্তের মধ্যে গায়ত্র সাম গীত হইবে। এই সূক্ত ত্রয়গানসাধ্য স্তোত্রকে 'বহিস্পবমান' বলে। পবমানার্থ ও সম্বন্ধত্বহেতু এই স্তোত্রস্থ ঋক্‌গুলির 'বহি' নামে অভিহিত হইবার তাৎপর্য।

২ 'আ নমস্তাজ্জয়ন্ত্যেভিরিত্যাজ্যামি'—ঐ-ব্রা° ২. ৫. ৪ ; তা-ব্রা° ৭. ২। উত্তরা গ্রন্থে তিনটি বহিস্পবমান সূক্ত ব্যতীত চারিটি সূক্ত আম্নাত হইয়াছে। এই চারিটি প্রাতঃসবনে গায়ত্র সাম দ্বারা গীত হয়। ইহাদের নাম আজ্যস্তোত্র।

৩ উত্তরাগ্রন্থে আজ্যস্তোত্র ব্যতীত যে তিনটি সূক্ত, সেই তিনটি মাধ্যন্দিনসবনে গায়ত্রা-বৃহৎমহীযব-রৌরব-যৌধাজয়-শনসান দ্বারা গীয়মান পঞ্চস্তোত্র মাধ্যন্দিন-সবনস্তোত্র।

৪ বৃহৎ, রথন্তর, বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্ক ও রৈবত এই ছয়টি-সামকে "পৃষ্ঠ" বলে।—তা-ব্রা° ৭. ৬. ৭ ; তৈ-ব্রা° ১. ২. ২. ৩। 'পৃষ্ঠানাং সমূহ পৃষ্ঠ্যঃ'—পা° বা° ৪. ২. ৪২। 'স্পৃশতি প্রাপ্নোতি স্বর্গো লোকোঽতেন সামষট্‌কেন ইতি পৃষ্ঠ্যঃ স্বর্গং লোকমস্পৃশংস্তস্মাৎ পৃষ্ঠ্যঃ'—শ-ব্রা° ১২. ২.

পবমান[৫] এবং অগ্নিষ্টোম সাম। এই শেষ স্তোত্র হইতেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের নামকরণ হইয়াছে।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সাধারণত এই যজ্ঞ 'অগ্নিষ্টোমসংস্থঃ ক্রতুঃ' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। তাই শতপথ ব্রাহ্মণে (৫. ১. ৩. ১) পাওয়া যায়—'আগ্নেয়ং অগ্নিষ্টোম আলভতে' ইহার সায়ণ-ভাষ্য এইরূপ—'অগ্নিঃ স্তূয়তেঽস্মিনিত্যাগ্নিষ্টোমো নাম সাম, তস্মিন্ বিষয়ভূত আগ্নেয়মালভতে, এতেন পশুনাঽস্মিন্ বাজপেঽগ্নিষ্টোমসংস্থং ক্রতুচেবানুষ্ঠিতবান্ ভবতি'। অথবা অগ্নির স্তোমে এই যজ্ঞের পর্যবসান হইত বলিয়া ইহার নাম অগ্নিষ্টোম।

সোমযাগে যতগুলি স্তোত্র অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও অপ্তোর্যামে হইয়া থাকে ততগুলি শস্ত্রও বিহিত। অগ্নিষ্টোমে দ্বাদশ (১২) শস্ত্র, অত্যগ্নিষ্টোমে ত্রয়োদশ (১৩), উক্‌থে পঞ্চদশ (১৫), ষোড়শীতে ষোড়শ (১৬), বাজপেয় সপ্তদশ (১৭), অতিরাত্রে পঞ্চবিংশতি (২৫) এবং অপ্তোর্যামে ত্রয়-স্ত্রিংশৎ (৩৩)।

প্রথমে সুলক্ষণযুক্ত পবিত্র ভূমি যজ্ঞক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত হইত, পরে যেখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইত, সেই স্থানেই যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট হইত।—শ-ব্রা° ৩. ১. ১. ৪। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছেন—"আমরা এক সময়ে বার্ষ্ণের জন্য যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতেছিলাম, পথিমধ্যে সাত্যযজ্ঞের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, সকল স্থানেই যজ্ঞ হয়, তোমরা যেখানে মন্ত্র লাভ করিবে সেইখানেই বার্ষ্ণকে লইয়া যজ্ঞ করিতে পার।"

২. ১১। রথন্তরাদি ছয়টি স্তোত্রকে পৃষ্ঠ্যস্তোত্র বলে। সপ্তম কোন পৃষ্ঠ্য-স্তোত্র নাই।—তৈ-স° (সা°) ১. ১৫।

৫ তৃতীয় সবনে গেয় গায়ত্র-সংহিত-শফ পৌষ্কল-শ্যাবাশ্ব-গন্ধীগব সাম দ্বারা নিষ্পাদ্য আর্ভব ছয়টি পবমান স্তোত্র ঋভুনামক দেবগণ কর্তৃক দৃষ্ট।—তা-ব্রা° ৮. ৪. ৫।

পূর্ব
উত্তর
দক্ষিণ
পশ্চিম
যূপ
ধিষ্ণ্য
ঐষ্টিক বেদি
আ·ধ = আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য
মা·ধ = মার্জালীয়
অন্যান্য ধিষ্ণ্য
১ অচ্ছাবাক, ২ নেষ্টা
৩ পোতা, ৪ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী
৫ হোতা, ৬ মৈত্রাবরুণ
উ = ঔদুম্বরী,
শ = হবির্দ্ধান শকটদ্বয়
আ = আহবনীয়, দ = দক্ষিণাগ্নি, ব = ব্রহ্মার আসন
গ = গার্হপত্য, য = যজমানের আসন, উ = উৎকর
প = পত্নীর আসন
হ = হোতার আসন
অ = অগ্নীতের আসন
প্র = প্রণীতা
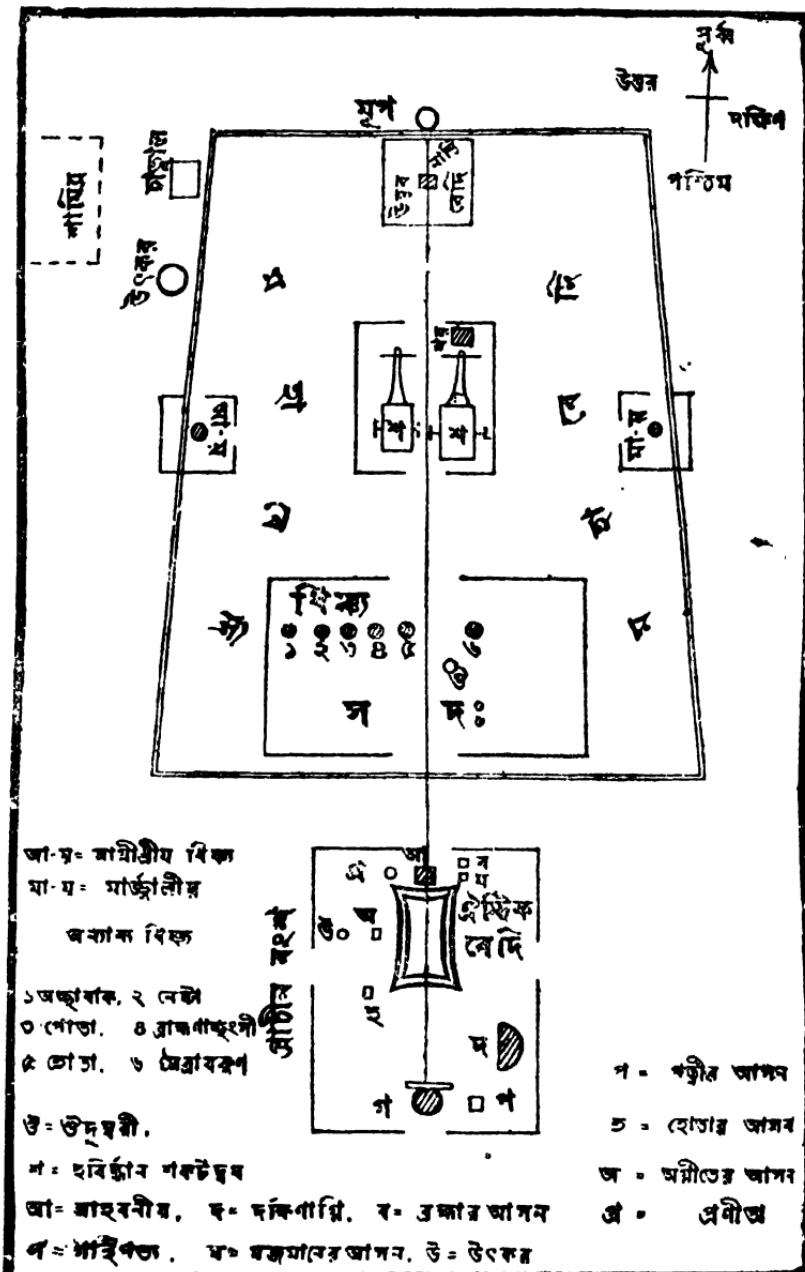
যজ্ঞভূমি পরিচয়

স্থান নির্দিষ্ট হইলে তথায় প্রথমে একটি মণ্ডপ নির্মাণ করা হইত। উহা চারিদিকে সমান ও প্রত্যেক দিকে ১২ অরত্নি-প্রমাণ। কনুই হইতে হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্যন্ত মাপকে 'অরত্নি' বলা হইত; উহা পূরা এক হাত ছিল না, কনুই হইতে মুষ্টিবদ্ধ হস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই মণ্ডপের নাম 'প্রাচীন বংশ'। ইহার চারিটি দ্বার থাকিত বলিয়া ইহাকে চতুর্দ্বার মণ্ডপও বলা হইত। মণ্ডপের চারিদিক তৃণাচ্ছাদিত করা হইত।

যজ্ঞমণ্ডপ নির্মাণের পর যজ্ঞের দ্রব্যসম্ভার আহরিত হইত। তৎপরে ঋত্বিগ্‌গণ যজমানকে সেই গৃহে লইয়া গিয়া দীক্ষা দান করিতেন।

হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতৃভেদে ঋত্বিক্‌ চতুর্বিধ। সকল যজ্ঞে সমান সংখ্যক ঋত্বিকের প্রয়োজন হইত না। সোমযাগে ১৬ জন ঋত্বিকের প্রয়োজন। ইহারা চারিগণে বিভক্ত— অধ্বর্যুগণ, ব্রহ্মগণ, হোতৃগণ ও উদ্গাতৃগণ। এক একটি গণে চারিটি চারিটি করিয়া ষোড়শ সংখ্যা পূর্ণ হয়। চতুর্গণ যথা—

ক	খ
অধ্বর্যুগণ	ব্রহ্মগণ
১ অধ্বর্যু	১ ব্রহ্মা
২ প্রতিপ্রস্থাতা	২ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী
৩ নেষ্টা	৩ আগ্নীধ্র
৪ উন্নেতা	৪ পোতা

গ	ঘ
হোতৃগণ	উদ্গাতৃগণ
১ হোতা	১ উদ্গাতা
২ মৈত্রাবরুণ বা প্রশাস্তা	২ প্রস্তোতা
৩ অচ্ছাবাক	৩ প্রতিহর্তা
৪ গ্রাবস্তুৎ	৪ সুব্রহ্মণ্য

উল্লিখিত ক্রম-অনুসারে সংখ্যানেরও ১ম, ২য় ইত্যাদি ক্রম

হইবে। অধ্বর্যুগণে অধ্বর্যু প্রথম, প্রতিপ্রস্থাতা দ্বিতীয় ইত্যাদি। তদনুসারে দক্ষিণায়ও ক্রমের বিধি। অধ্বর্যু যতগুলি গো পাইবেন তাহার অর্ধেক প্রতিপ্রস্থাতা পাইবেন। অধ্বর্যুর ভাগের তৃতীয় অংশ নেষ্টা পাইবেন, চতুর্থ অংশ উন্নেতা। ইহাদিগকে অর্ধী, তৃতীয়ী, পাদীও বলা হইয়া থাকে। গণান্তরেরও এইরূপ ব্যবস্থা। এই ঋত্বিগ্‌গণকে বেদত্রয়-সম্বন্ধীয় কর্ম করিবার জন্যই বরণ করা হইয়া থাকে। আপস্তম্ব বলেন, এই ষোলজন ঋত্বিক্ ছাড়া এই যজ্ঞে 'সদস্যে'রও প্রয়োজন আছে। তাহা হইলে ১৭ জন ঋত্বিকের আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে চারিজন প্রধান ঋত্বিক্; যথা—হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা। অবশিষ্ট ঋত্বিকেরা ঐ চারিজনের সাহায্য করিতেন। হোতার সাহায্যকারী তিনজন—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তুৎ। উদ্গাতার সাহায্যকারী প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা ও সুব্রহ্মণ্য। অধ্বর্যুর সাহায্যকারী প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা। ব্রহ্মার সাহায্যকারী ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা ও আগ্নীধ্র।

দেবতার স্তব ও আহ্বানকার্য হোতাকে করিতে হইত। যজ্ঞে আহুতিদান হইতে হোমদ্রব্য প্রস্তুত করা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক প্রধান কর্মসকল অধ্বর্যুকে করিতে হইত। উদ্গাতা দেবতার সন্তোষজনক সামগান করিতেন। কর্ম-বিশেষে অনুমতি দেওয়া এবং সকলের কার্য দেখা-শুনা করা ও জপ করা ব্রহ্মার কার্য। সদস্যের কার্য দোষগুণ পর্যবেক্ষণ করা।

বসন্তকালের যে কোন পুণ্যদিনে অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান করিতে হয়—প্রারম্ভে আভ্যুদয়িক। সাধারণত শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমায় অগ্নিষ্টোম সমাপন করিতে হয়। ইহাই সম্প্রদায়গত বিধি। আভ্যুদয়িকের পর ঋত্বিগ্‌বরণ। সোমপ্রবাক নামক ঋত্বিক্‌কে প্রথমে বরণ করিতে হয়। ইনি বৃত হইয়া অধ্বর্যু প্রভৃতির গৃহে গমন করেন, সেখানে তাঁহাদিগকে বলেন—অমুক-শর্মার যজ্ঞ হইবে, সেখানে আপনাদিগকে ঋত্বিকের কার্য করিতে

হইবে। এইরূপ বাক্যে তাঁহাদিগকে লইয়া যজমানের গৃহে আগমন করেন। যজমান এই সকল ঋত্বিক্‌কে বরণ করেন। শাখান্তরে সদস্যবরণও উক্ত হইয়াছে (আপ-শ্রৌ° সূ° ১০. ১. ৯-১০)। কিন্তু প্রচলিত শ্রুতিতে তাহা নিষিদ্ধ (শ-ব্রা° ১০. ৪. ১. ১৯)। অতঃপর বৃত ঋত্বিগ্‌গণকে মধুপর্ক দান করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠান গৃহে করিয়া তারপর অগ্নিসমারোপনপূর্বক যেখানে সোমদ্বারা যজন হইবে সেই স্থানে যজমান গমন করেন। এই স্থানে শালা বা বিমিত নির্মাণ করিয়া বিতান প্রস্তুত করিতে হয়। তারপর অরণি মন্থন করিয়া তাহা হইতে উত্থিত অগ্নিচয় কুণ্ডসমূহে যথারীতি স্থাপন করিতে হইবে। অপরাহ্ণে যজমান ও তৎপত্নী অভীষ্ঠ ভোজন করিবেন, নাও করিতে পারেন। তবে প্রথম দিনেই ইঁহারা ভোজন করিতে পারিবেন। অতঃপর অবভৃথ। অনন্তর পুনরায় উভয়ের ভোজন। মধ্যে ব্রতপ্রাশন বিহিত। এই সময়ে ঋত্বিকেরা যজমানকে যজ্ঞ-মণ্ডপে লইয়া গিয়া দীক্ষিত করেন। দীক্ষা-গ্রহণের সময় যজমান প্রথমে ক্ষৌরকর্ম, পরে স্নান ও নববস্ত্র পরিধান করিয়া মাঙ্গল্যদ্রব্য ধারণ করেন। পশ্চাৎ জ্ঞাতি-কুটুম্বের সহিত যজ্ঞশালায় নীত হন। ঋত্বিকেরা দর্ভপিঞ্জলী অর্থাৎ কুশগুচ্ছের দ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ মার্জন করেন। বেদমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজমানকে 'প্রাচীন বংশ' নামক যজ্ঞ-মণ্ডপের পূর্বদ্বার দিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করান। প্রবেশের পরেই তাঁহাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করাইতে হয়। এই কার্য করিতে মাত্র একটি ক্ষুদ্র হোম করান হইয়া থাকে। ইহার নাম 'দীক্ষণীয়া ইষ্টি'। এই ইষ্টিতে অগ্নাবিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে একাদশটি পুরোডাশ হোম করা বিধেয়।

তৎপরে যে যজমান ইতঃপূর্বে সোমযাগ করেন নাই তাঁহার জন্য 'ত্বমগ্নে স প্রথা অসি জুষ্টো হোতা বরেণ্যঃ। ত্বয়া যজ্ঞং বিতন্বতে' (ঋ° ৫. ১৩. ৪)। এবং 'সোম যাস্তে ময়োভুব উতয়ঃ সন্তি দাশুষে। তাভির্নোঽবিতা ভব' (ঋ° ১. ৯১. ৯)—এই দুইটি ঋঙ্‌মন্ত্র হোতা

অধ্বর্যু'র আদেশ অনুসারে পাঠ করেন। এই দুইটি মন্ত্র যাজ্যা ভাগদ্বয়ের পুরোঽনুবাক্যরূপে পঠিত হয়।

তৎপরে যাজ্যাভাগ দান-কর্মাঙ্গে নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে হবিঃ-প্রদানের জন্য অনুবাক্যা ও যাজ্যারূপে ব্যবহৃত হয়।

১ম—"অগ্নিমুখং প্রথমো দেবতানাং সংগতানামুত্তমো
বিষ্ণুরাসীৎ।
যজমানায় পরিগৃহ্য দেবান্ দীক্ষয়েদং
হবিরাগচ্ছতং নঃ॥"[১]

২য়—অগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তম মহো দীক্ষাপালায়
বনতং হি শক্রা।
বিশ্বৈর্দেবৈর্যজ্ঞিয়ৈঃ সংবিদানৌ দীক্ষামস্মৈ
যজমানায় ধত্তম্॥"[২]

দীক্ষাকার্য শেষ হইলে প্রথমে প্রতিপ্রস্থাতা উচ্চৈঃস্বরে দেবতা ও মনুষ্যদিগকে শুনাইয়া বলেন, 'দীক্ষিতোঽয়ং ব্রাহ্মণঃ' অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইলেও ব্রাহ্মণ বলা হইত।[৩]

তৎপরে দ্বিতীয় দিনের কৃত্য। দীক্ষিত যজমান নিজে 'প্রায়ণীয়েষ্টি' নামক ক্ষুদ্র যাগ করেন। এই যাগে পঞ্চ দেবতা—অদিতি, পথ্যাস্বস্তি, অগ্নি, সোম ও সবিতা; তন্মধ্যে অদিতি প্রধান। এই যজ্ঞে চরু পাক করিয়া তাহার দ্বারা অদিতি এবং (আজ্য) ঘৃতের

১ কা-স° ৪.১৬; তৈ-ব্রা° ২.৪.৩.৩; আপ-শ্রৌ° সূ° ৪.২.৩।

২ ঐ-ব্রা° ১.৪.৮; তৈ-ব্রা° ২.৪.৩.৪; আপ-শ্রৌ° সূ° ৪.২.৩।

৩ প্রযন্তি স্বর্গমনয়া সা প্রায়ণীয়া। ইহা দ্বারা ইষ্টি করিয়া সোমযাগ আরব্ধ হয়।—কা-শ্রৌ° সূ ৭.৫.১৩; আপ-শ্রৌ° সূ° ৪.২.১৮; ৪.৩.১। যে দিন সোম ক্রয় করা হয় সেই দিনই প্রায়ণীয়েষ্টি করিতে হয়।—তৈ-স° ৬.১.৫.১; শ-ব্রা° ৩.২.৩.২; নিরুক্ত ১৩.১.৭।

দ্বারা পথ্যাস্বস্তি, অগ্নি, সোম ও সবিতা এই চারি দেবতার উদ্দেশ্যে যাজ্যাহুতি দিতে হয়। অনুযাজের পর শংযুবাক সমাপ্তি। এই ইষ্টি সম্পন্ন হইলেই প্রকৃত পক্ষে যজ্ঞের আরম্ভ হয়। পরে 'উদয়ণীয়া ইষ্টি' করিয়া সোমযজ্ঞের শেষ করিতে হয়। প্রথমে প্রতিপ্রস্থাতা নামক ঋত্বিক্ 'উপসব' প্রদেশে একখানি বৃষচর্ম বিস্তার করেন এবং তাহার উপরে কুশ বিছাইয়া তদুপরি সোমলতার বোঝা স্থাপন করেন। সোমবিক্রেতা সোমের অংশুগুলি বা তন্তুসকল পরীক্ষা এবং পরিষ্কার করিতে থাকে। পরে ১৭ জন ঋত্বিক্-সহ যজমান তথায় আসিয়া উহা একটি অরুণবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু এক বৎসরের গোবৎসের বিনিময়ে ক্রয় করেন। পরে বিক্রেতাকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করিয়া রাজা সোমকে শকটে তুলিয়া সেই 'প্রাচীন বংশ' নামক যজ্ঞগৃহে পূর্বদ্বার দিয়া আসিয়া 'আহবনীয়' নামক অগ্নিকুণ্ডের দক্ষিণদিকে একখানি কাষ্ঠের পিঁড়ির উপর মৃগচর্ম বিছাইয়া তাহার উপর রাখিতে হয়। এই সময়ে 'আতিথ্যেষ্টি' নামক অপর একটি ছোট রকমের যজ্ঞ করিতে হয়।[৪] ইহা খণ্ডেষ্টি। ইহার উদ্দেশ্যে রাজা সোম যজমানের গৃহে অতিথি হইয়া আসিতেছেন। অতিথির যথোপযুক্ত সৎকার করা কর্তব্য, এইজন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে আতিথ্য হবিঃ নির্বপণ করা হয়। ইহার পরে সোমপ্রবহণ (৩ অ° ১ খ°), অগ্নিমন্থন (৫ খ°), আতিথ্যেষ্টি (৬ খ°), প্রবর্গ্যকর্ম (৪ অ° ১ খ°), উপসদিষ্ট (৮ খ°), উপাস্ত-সোমপ্যায়ননিহ্নব (৯ খ°) যথাবিধি সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাদের ভিতর আমরা কয়েকটি যজ্ঞ সম্বন্ধে কিছু বলিব। উপসদ যজ্ঞটি সোমযজ্ঞের বিঘ্নকারী অসুরদিগের পরাভবের জন্য করিতে হয়। ইহাতে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সোম ও বিষ্ণু-দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাহুতির দ্বারা হোম করিতে হয়; এই যজ্ঞ তিনদিন ব্যাপী। তৃতীয় দিনে প্রাতঃকালে প্রবর্গ্য উপসদের কৃত্য সম্পাদন করিয়া সৌমিকী মহাবেদী নির্মাণ করিতে হয়। ইহা

৪ আতিথ্যেষ্টির দেবতা বিষ্ণু; নবকপাল পুরোডাশ—দ্রব্য।

বংশশালার সম্মুখে তিনপদ পরিমিত ভূভাগ ছাড়িয়া পূর্ব-পশ্চিমে আয়ত ও বিস্তৃত করিয়া নির্মিত হয়। এই বেদীটির উপরিভাগ ও চারিদিক্ লতা-বিতান দ্বারা আবৃত করা হয়। ইহার সম্মুখভাগের নাম 'অংস' ও পশ্চাদ্ভাগের নাম 'শ্রোণী'। অংসপ্রদেশে দশপদ পরিমিত একটি বেদী রচনা করা হয়। ইহাকে 'উত্তর বেদী' বলা হয়, ইহা দেখিতে অগ্নিহোত্র বেদীর মত কৃশমধ্য। এই বেদীর অংস-প্রদেশের উত্তরভাগে পূর্ব-পশ্চিমে একপদ আয়ত এক বেদী নির্মিত হয়। ইহার আকারও অগ্নিহোত্র বেদীর মত। ইহার পর মহাবেদীর মধ্যভাগে শ্রোণী রেখা টানা হয়। মধ্য হইতে অংস পর্যন্ত এই রেখার নাম 'পৃষ্ঠ্যা'। মহাবেদীর উত্তরাংশের পশ্চাদ্-ভাগে তিন পা দূরে 'চত্বালক' নামে একটি গর্ত খনন করা হয়। ইহা হইতে বার পা দূরে 'উৎকর' নামক আর একটি গর্ত খনিত হয়।

এইগুলি নির্মিত হইলে অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা 'হবির্ধান' নামক দুইখানি শকট সেই উৎকর গর্তে ধৌত করিয়া পশ্চিমধার দিয়া বেদীতে আনিয়া শ্রোণীর নিকটে রাখেন এবং 'পৃষ্ঠ্যা' নামক রেখার দক্ষিণপার্শ্বে একখানি শকট মধ্যে রাখিয়া দক্ষিণ-উত্তর ক্রমে ৩ অরত্নি এবং ৯ অরত্নি পরিমিত চতুরস্র এবং চারিটি স্তম্ভবিশিষ্ট একটি মণ্ডপ নির্মাণ করেন। এই মণ্ডপের নাম 'হবির্ধান' মণ্ডপ। ইহার পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি দরজা থাকে। বীরণ অর্থাৎ শরপত্রের মাদুর দিয়া চারিদিক্ আচ্ছাদিত করা হয়।

তৎপরে মণ্ডপের মাঝখানে সমান চারিটি প্রকোষ্ঠ তৈয়ারী করিতে হয় এবং উহার অগ্নিকোণস্থ প্রকোষ্ঠের মাঝখানে এক হাত প্রমাণ সমচতুরস্র কাল্পনিক রেখা টানিয়া প্রত্যেক কোণের প্রান্ত-ভাগে বিস্তারে অর্ধ-হস্ত ও গভীরতায় এক-হস্ত এরূপ চারিটি গর্ত করিতে হয়। এই গর্তগুলির মুখে বরুণ কাঠের অথবা যজ্ঞডুম্বুর কাঠের চারিখানি ফলক দ্বারা পুটিত অর্থাৎ বন্ধ করিতে হয়। এই

কাঠের উপর বৃষচর্ম ও তদুপরি শিলাপট্ট বা পাথরের পাটা রাখিতে হয়। ইহাতেই রস-নিষ্কাষণের জন্য সোম পিষ্ট হইয়া থাকে।

'হবির্ধান'-মণ্ডপের সম্মুখে 'পৃষ্ঠ্যা' নামক স্থানের দক্ষিণে হবির্ধান মণ্ডপের মত 'সদোপমণ্ডপ' নির্মিত হইয়া থাকে অর্থাৎ মহাবেদী বা সৌমিক বেদীর পশ্চিমাংশে এই মণ্ডপ। এই মণ্ডপ দশ অরত্নি প্রমাণ পূর্বায়ত, নয় অরত্নি দীর্ঘ, চতুরস্র, স্তম্ভ-সুশোভিত এবং সুপরিষ্কৃত। এই সদোপমণ্ডপের ঠিক মধ্যভাগে যজমানের তুল্য-প্রমাণ একটি ঔদুম্বরীস্থূণা (অর্থাৎ যজ্ঞডুম্বুর কাঠের খোঁটা) প্রোথিত করা হয়। ইহার পশ্চাতে সদোপমণ্ডপ ও হবির্ধান-মণ্ডপের উত্তরভাগে আগ্নীধ্রশালা নির্মিত হইয়া থাকে। ইহার পরিমাপ পূর্বেরই মত, কেবল ইহা পূর্ব-পশ্চিমে একটু দীর্ঘ। ইহার অর্ধাংশ বেদীর প্রান্ত-প্রদেশে প্রবিষ্ট এবং অপর অর্ধাংশ বাহিরে নিঃসৃত থাকে। দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ইহার দুইটি দ্বার থাকে। এই সদোপমণ্ডপের মধ্যে উত্তর হইতে দক্ষিণে সারি বাঁধিয়া ৬টি 'ধিষ্ণ্য' থাকে। এগুলি মৃত্তিকা ও কাঁকরের এক-হস্ত প্রমাণ বেদী। 'ধিষ্ণ্য' গুলির প্রায় মধ্যভাগে ঔদুম্বরী স্থাপিত হয়। ধিষ্ণ্যগুলির মধ্যে দুইটি ধিষ্ণ্যের মধ্যে যেটি দক্ষিণভাগে অবস্থিত সেটির নাম 'মার্জালীয়', আর যেটি উত্তরভাগে অবস্থিত সেটির নাম 'আগ্নীধ্রীয়' অগ্নিকুণ্ড। সদোপমণ্ডপ মধ্যে অচ্ছাবাকের জন্য ১টি, নেষ্টার জন্য ১টি, পোতার জন্য ১টি, ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর জন্য ১টি ও মৈত্রাবরুণের জন্য ১টি ; আগ্নীধ্রর জন্যও ১টি ধিষ্ণ্য থাকে। এই সাতটি ধিষ্ণ্য দক্ষিণ হইতে উত্তরে যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, হোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক ও আগ্নীধ্র এই সাতজন ঋগ্বেদী ঋত্বিকের জন্য। সবনত্রেয় শস্ত্রপাঠের সময় ঐ ঋত্বিকেরা আগ্নীধ্র হইতে অগ্নি লইয়া নিজ নিজ ধিষ্ণ্যে জ্বালিতে থাকেন। এই মণ্ডপমধ্যে ধিষ্ণ্যের পার্শ্বে শস্ত্রপাঠকেরা শস্ত্রপাঠ করেন ও ঔদুম্বরী ধরিয়া উদ্গাতারা স্তোত্রগান করেন।

মহাবেদীর সম্মুখে এবং আহবনীয় কুণ্ডের নিকটে যজ্ঞীয় যূপস্তম্ভ

প্রোথিত করা হয়। যজ্ঞীয় যূপসকল অষ্টাস্র বা আট পোয়ালে হইত। বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে ইহার উচ্চতার তারতম্য হইত। সোমযজ্ঞে যূপের উচ্চতা পঞ্চ অরত্নি হইতে পঞ্চদশ অরত্নি পর্যন্ত হইত। যূপগুলি খদির কাষ্ঠ বা তাহার অভাবে পলাশ কাষ্ঠের হইত।

সোমযাগে অধিকার পাইবার পূর্বে তিনদিন ধরিয়া যে সকল কর্ম অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহার নাম 'প্রবর্গ্য যজ্ঞ'। এই যজ্ঞ দুইদিন পূর্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে ও তৃতীয় দিন পূর্বাহ্ণে দুইবার করিতে হয়। উপসদিষ্টির পর ইহা করা উচিত। ইহাতে ছয়জন ঋত্বিকের আবশ্যক—ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্যু, অগ্নীৎ, প্রতিপ্রস্থাতা ও প্রস্তোতা। প্রধান হব্যের নাম 'ঘর্ম'। মহাবীর নামক মৃদ্‌ভাণ্ডে গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া পাক করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। অধ্বর্যু মহাবীর নির্মাণ ও ঘর্ম পাক হইতে আহুতি দান পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় কাজগুলি করেন। এই কার্যে প্রতিপ্রস্থাতা তাঁহার সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রস্তোতা সামগান করেন, হোতা প্রত্যেক কর্মের অনুকূল স্তব বা অভিষ্টব মন্ত্র পাঠ করেন। যজ্ঞান্তে সকলে ঘর্ম-শেষ ভক্ষণ করেন। ইহার পর চতুর্থদিনে 'বৈসর্জন' নামক হোম করিতে হয়।

এই দিনেই অগ্নিষোমীয় পশু যূপে বন্ধন করা হয়। অগ্নি-প্রজ্বালন ও সোম-প্রণয়ন হইলেই তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অগ্নি-ষোমীয় পশুযাগ করা উচিত। অগ্নিষোমীয় পশু দুই বর্ণের হওয়াই উচিত, কারণ এই যজ্ঞ অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট। ব্রহ্মবাদীরা কিন্তু এই নিয়ম মানিয়া চলেন না। তাঁহাদের মতে পশু স্থূল হওয়া কর্তব্য

বংশশালার উত্তর বেদীস্থিত সোমলতা আনীত হইয়া যখন হবির্ধান-মণ্ডপে রাখা হয়। তখন যজ্ঞের পশুকে পবিত্র জলে স্নান করাইয়া যূপের সম্মুখে পশ্চিমমুখে রাখিতে হয়। পরে কুশ পিঞ্জলিযুক্ত প্লক্ষ-শাখার দ্বারা স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপূত করা হয়। প্লক্ষ

ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য।—ঐ-ব্রা° ৭. ৬. ৩৫। ইহার পর হইতে পশু-হনন পর্যন্ত যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সেগুলির নাম পশ্বালম্ভন।

যজ্ঞকার্যের জন্য জাতদন্ত, অবিকৃতাঙ্গ, নীরোগ ও পুষ্ট একটি মাত্র ছাগই গ্রহণ করা বিধেয়। এই প্রকারের পশু যজ্ঞস্থলে নীত হইলে ঋত্বিকেরা উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন। তৎপরে তাঁহারা আধুনিক বলিদান প্রথায় ছাগকে হনন না করিয়া 'সংগপন' কার্য সম্পন্ন করিতেন অর্থাৎ মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি নিষ্ঠুর উপায়ে ছাগকে বধ করিতেন। এই কার্য যে কোন ব্যক্তি সম্পন্ন করিতে পারিতেন। ইহার পর উহার হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষ, যকৃৎ, বৃক্কদ্বয় সম্মুখের বামপদ, পার্শ্বদ্বয়, দক্ষিণ শ্রোণী, পায়ুনাল, বপা ও বসা প্রভৃতি কয়েকটি অঙ্গ কাটিয়া 'শামিত্র' নামক অগ্নিকুণ্ডে পাক করিয়া মন্ত্রগান করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হয়। এই হোমের কার্যের নাম 'অগ্নিষ্টোমীয় পশুযাগ'।

ইহার পর ঋত্বিকেরা এই দিন চাত্বাল ও উৎকর ভূমির উত্তর ভাগে অবস্থিত জলাশয় হইতে জল আনিয়া যজ্ঞশালায় রাখেন। এই জলের বৈদিক নাম 'বসতীববী'। এই দিবস রাত্রিকালে যজমান ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পুরাতন ঐতিহ্য ও দেবচরিত্র শ্রবণ করিতেন; এইজন্য এই দিনের নাম ছিল 'উপবসথ'।

ইহার পরদিনের নাম 'সুত্যাদিবস'*। ইহা পঞ্চম দিনের নামান্তর। এই দিনে অধ্বর্যু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া হবির্ধান-শকট হইতে সোম আহরণ করিয়া উপসব স্থলে রাখিয়া দেন। অধ্বর্যু অতি প্রত্যুষে উঠিয়া হোতাকে 'প্রেষমন্ত্রে' উদ্বুদ্ধ করেন অর্থাৎ এই মন্ত্রদ্বারা কর্মানুষ্ঠানে প্রেরণা আনয়ন করেন। হোতাও প্রাতরনুবাক্ পাঠ করিয়া অশ্বিনীকুমারকে স্তব করিতে থাকেন, আগ্নীধ্র পুরোডাশ প্রভৃতি তৈয়ারী করেন এবং উন্নেতা সোম-পাত্রসকল সুবিন্যস্ত করিতে থাকেন। সোমপাত্র গ্রহ ও

* যস্যাং ক্রিয়ায়াং সোমহভিস্য়তে সা সুত্যা।

স্থালীভেদে দুই প্রকার। গ্রহগুলি কাষ্ঠ-নির্মিত ও স্থালীগুলি মৃত্তিকা নির্মিত।

তৎপরে হবির্ধান-শকটের অক্ষ-প্রদেশে দুইখানি ঔর্ণবস্ত্র অর্থাৎ মেষলোমের কম্বল সোমরস-শোধন জন্য স্থাপন করা হয়। উহার একখানি প্রাদেশ ও অপরখানি অরণি পরিমাণ। তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থানের পরিমাপকে 'প্রাদেশ' বলে।

ইহার পর দক্ষিণ হবির্ধান-শকটের নিম্নে মৃন্ময় দ্রোণকলস স্থাপন করা হয় এবং উত্তর হবির্ধান-শকটের উপরে উপভৃত ও আধবনীয় নামক দুইটি বৃহৎ কলস রাখা হয়। অধিকন্তু উত্তর শকটের নিম্নে ১০ খানি কাষ্ঠ চমস ও ৫টি মৃন্ময় ঘট স্থাপিত করা হয়। ঐ সকল কার্য উন্নেতাই করিয়া থাকেন।

পরে অধ্বর্যু'র আদেশক্রমে যজমান ও তাঁহার পত্নী এবং চমসাধ্বর্যু ঘটদ্বারা জল আনয়ন করেন। পুরুষেরা যে জল আনেন তাহার নাম 'একধনা' ও তাঁহাদের পত্নীর আনীত জলের নাম 'পান্নেজন'। অধ্বর্যু এই দুই প্রকার জল পূর্বকথিত 'বসতীবরী' জলের সহিত মিশ্রিত করেন। পরে যজমান, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা এবং অধ্বর্যু এই কয়জন ঋত্বিক্ 'সোমাভিষব' ফলকের নিকট উপবিষ্ট হইয়া উপলখণ্ড লইয়া অনুজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকেন। ইহার পর অধ্বর্যু পাঁচ মুঠা সোম সেই প্রস্তরফলকে রাখিবেন, প্রতিপ্রস্থাতা সেই সোমপুঞ্জ হইতে ছয়টি সোমের অংশু গ্রহণ করিয়া আপনার অঙ্গুলি-সন্ধিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। পরে সকলে একত্র হইয়া পেষণ কার্য করিবেন। ইহা হইতে সোম নিষ্কাশিত হইবে। এই নিষ্কাশনের নাম 'সোমাভিষব'। ইহা দিনে তিনবার মাত্র করা হয়—প্রাতঃকালীন সোমাভিষবের নাম প্রাতঃ সবন, মধ্যে মধ্যাহ্নসবন, সায়ংকালে সায়ংসবন। অভিষুত সোম-রস আহুতি প্রদত্ত হয়, অবশিষ্ট ভাগ পানার্থ রক্ষিত হয়।

সোমাভিষব হইয়া গেলে ঋত্বিগ্‌গণ 'মহাভিষব' অর্থাৎ প্রচুর

পরিমাণে সোম পেষণ আরম্ভ করিয়া দেন। অধ্বর্যু ইহা জল-সেচন করিতে থাকেন। উত্তমরূপে পিষ্ট হইলে উহা আধবনীয় কলসে ফেলিয়া আলোড়ন করিতে থাকেন। পরে উহা বস্ত্রের দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া লওয়া হয়। সেই রস ক্রমে 'গ্রহ', 'চমস' ও 'কলসে' পূর্ণ করা হয়। এই সময় নানা প্রকার বেদমন্ত্রের পাঠ হয় ও সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, বিশ্বদেব, ইন্দ্র, মহেন্দ্র, বৈশ্বানরাগ্নি, চৈত্রাদি চতুর্দশ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা*, ইন্দ্রাগ্নি, মরুদ্‌গণ সহিত ইন্দ্র, ত্বষ্টৃ সহিত অগ্নি-পত্নী স্বাহা বা অগ্নায়ী সোমযাগের দেবতাবৃন্দের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়। পরে ঋত্বিগ্‌গণ যজমান যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। ঋত্বিক্ ও যজমানের সোমপান-বিধি একরূপ নয়। ঋত্বিকেরা প্রত্যেক সবনেই অবশিষ্ট সোম পান করিতেন ; যজমান কেবল সায়ংসবনে পান করিতেন।

যজ্ঞ শেষ হইলে যজমান সদোপমণ্ডপে গিয়া ঋত্বিগ্‌গণকে দক্ষিণা দান করিতেন। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দক্ষিণাবিভাগ ক্রমে দ্বাদশ শত গাভী, অভাবে শত গাভী এবং সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ, মেষ, ছাগ, অন্ন, যব ও মাসকলাই।

ইহার পর যজ্ঞে নিযুক্ত ঋত্বিকেরা সপত্নীক যজমান, বন্ধু, বান্ধব, সুহৃদ্‌বর্গসহ কোন মহানদীতে, অভাবে কোন পুণ্য জলাশয়ে গমন করিয়া 'অবভৃথ' স্নান করিয়া থাকেন। যাইবার সময় প্রস্তোতা সামগান করিতে করিতে যান ও পত্নীসহ যজমান ও বন্ধুবান্ধবেরা 'নিধন' বাক্য গাহিতে গাহিতে যান। এই 'নিধন' বাক্য আমাদের গানের 'ধুয়া'র ন্যায়। জলাশয়ের নিকটে গিয়া সপত্নীক যজমান পুরোডাশাহুতি দিলে সকলে জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। স্নানান্তে যজমান ও তাঁহার পত্নী দীক্ষাকালে গৃহীত কৃষ্ণাজিন আদি ত্যাগ করেন ও বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া 'উদায়নীয় ইষ্টি' প্রভৃতি সম্পন্ন

* প্রকৃত মাস দ্বাদশ হইলেও দুইটি মলমাসের সহিত চতুর্দশ হইয়াছে।

করিবার জন্য যজ্ঞস্থলে দেবযজন দেশে ফিরিয়া আসেন। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞেই যে কেবল অবভৃথ স্নানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নয়, ইহা সমস্ত বৃহৎ যজ্ঞেরও অঙ্গ।

অতিরাত্র রাত্রিব্যাপী সোমযাগ-বিশেষ। অতিরাত্র যাগে রাত্রিকালে নির্দিষ্ট সময়ে তিনটি পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক পর্যায়ে সোমপূর্ণ চমস ঋত্বিগ্‌গণের নিকট চারিবার ঘুরাইয়া আনিতে হয়। এক একবার ঘুরাইয়া আনিবার সময় এক এক শস্ত্র ও এক এক যজ্যা পঠিত হয়। যাজ্যান্তে সোমাহুতি হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রথমে হোতার, পরে মৈত্রাবরুণের, অতঃপর ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর ও তৎপরে অচ্ছাবাকের চমস ঘুরাইয়া আনা হয়। এইরূপ আরও দুইটি পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়। চমস ঘুরিয়া আসে বা পরিভ্রমণ করে বলিয়া ইহার 'পর্যায়' (round) আখ্যা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে অতিরাত্র যাগে রাত্রির পর্যায় হইতেছে ১২টি।*

* এক একবারের অনুষ্ঠানে এক এক পর্যায়। এই পর্যায়গুলি ১৫শ স্তোমবিশিষ্ট। প্রথম ঋকে তিন বার তৎসাম পাঠ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে এক একবার পাঠ করিতে হইবে। ইহাই প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে ৫টি সংখ্যা পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম ঋক্ একবার পাঠ করিয়া দ্বিতীয় ঋক্ তিনবার পাঠ করিতে হইবে। তৃতীয় ঋক্ একবার। এখানেও ৫টি সংখ্যা পূর্ণ হয়। তৃতীয় পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্ এক একবার পাঠ করিয়া তৃতীয় ঋক্ তিনবার পাঠ করিতে হইবে। এখানেও পঞ্চ সংখ্যা পূর্ণ হয়। সমস্ত মিলিয়া পঞ্চদশ। ইহাই পঞ্চদশ স্তোম।

পর্যায়গুলির মধ্যে দুই দুই পর্যায়ের স্তোমসংখ্যা একযোগে ত্রিশটি হয়। অথবা ষোড়শি সাম একুশটি। সন্ধিস্তোত্র নয়টি—এইরূপে উহা ত্রিশটি। এই রূপে অতিরাত্র মাসের স্বরূপ, কেননা মাসে রাত্রি ত্রিশটি। মাস হইতে সংবৎসর সম্পাদিত হয়। সংবৎসরই অগ্নিবৈশ্বানর। অগ্নিই অগ্নিষ্টোম। এইরূপে সংবৎসরের অনুসরণ করিয়া অতিরাত্র অগ্নিষ্টোম প্রবেশ করে। তৎ প্রবিষ্ট অতিরাত্রের অনুসরণ করিয়া অপ্তোর্যাম অতিরাত্র-স্বরূপ হয় এবং অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

এই ১২টি পর্যায়ে ১২টি স্তোত্র ভিন্ন ভিন্ন সুরে গীত হয়। তারপর প্রভাতে সামবেদের (২. ৯৯-১০৪) ৬টি সন্ধিস্তোত্র গীত হয়। ইহা হোতার আশ্বিন শস্ত্রের অনুরূপ এই আশ্বিন শস্ত্র প্রাতরনুবাকের প্রকারভেদ মাত্র। প্রাতরনুবাক সাধারণত সোমযাগের সুত্যাদি-বসের প্রথমেই প্রযুক্ত হয়।

অতিরাত্রসংস্থে সরস্বতীদেবীর জন্য চতুর্থ পশু ছাগ যূপালব্ধ করিতে হয়। অথবা অতিরাত্রে মেষী চতুর্থ পশু হয়।* ষোড়শি-

প্রথম পর্যায়ে স্তোত্রগানে অসুরদের অশ্ব ও গরু, মধ্যম পর্যায়ে স্তোত্রগানে শকট ও রথ এবং অন্তিম পর্যায়ে স্তোত্রগানে অসুরদের বস্ত্র, হিরণ্য ও মণি কাড়িয়া লওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে স্তোত্রের প্রথম চরণ, মধ্যম পর্যায়ে স্তোত্রের মধ্যম চরণ ও অন্তিম পর্যায়ে স্তোত্রের অন্তিম চরণ দুইবার করিয়া উচ্চারিত হয়।

দিবসের কর্ম পবমানযুক্ত, রাত্রির কর্ম পবমানযুক্ত নহে; কিন্তু দিবস ও রাত্রির উভয়েই পবমানযুক্ত ও সমানভাগযুক্ত। তাহার কারণ অতিরাত্রে 'ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতম্' (৬. ৯২. ১৯), 'ইদং বসো সুতমন্ধঃ' (৮. ২. ১) এবং 'ইদং হ্যন্বোজসা সুতম্' (৩. ৫১. ১০) ইত্যাদি মন্ত্রে স্তোত্রগান হয় ও শস্ত্রপাঠ হয়; তাহাতেই রাত্রির কর্ম পবমানযুক্ত হইয়া থাকে, দিন কর্মের সহিত সমান ভাগযুক্ত হয়।

দিবসে পনের স্তোত্র এবং রাত্রিতে বারটি স্তোত্র, তাহাদের নাম অপিশর্বর (প্রতি পর্যায়ে চারিবার সোমাহুতি শস্ত্রপাঠ ও স্তোত্রগান হয়, অতএব তিন পর্যায়ে বারটি স্তোত্র)। ইহা ছাড়াও তিন দেবতার উদ্দেশে রথান্তর নামক সন্ধিস্তোত্র উচ্চারিত হয়। এইরূপ দিবসকর্ম ও রাত্রিকর্ম পঞ্চদশ স্তোত্রযুক্ত হয়।

* 'সরস্বত্যৈ চতুর্থোঽতিরাত্রে, মেষী বা।'—কা-শ্রৌ° ৯. ৮. ৫।

'অতিরাত্রসংস্থে জ্যোতিষ্টোমে চতুর্থশ্ছাগঃ। সরস্বত্যৈ যূপে আলব্ধব্যঃ। পশুত্রয়ং তু পূর্বোক্তমেব। অথবা অতিরাত্রে চতুর্থঃ পশুর্মেষী স্যাৎ।'—ঐ।

'অতিরাত্রে পশুচতুষ্টয়ং স্তোমায়নম্। এবঞ্চ অগ্নিষ্টোমসংস্থায়াং এক এব পশুঃ কার্যঃ। উক্থ্যসংস্থায়াং আগ্নেয়ঃ প্রথমতঃ, ঐন্দ্রাগ্নো দ্বিতীয় ইতি পশুদ্বয়ং কার্যম্। ষোড়শিসংস্থায়াং আগ্নেয়ঃ, ঐন্দ্রাগ্নঃ, ঐন্দ্রশ্চেতি পশুত্রয়ম্। অতিরাত্রে ইমে ত্রয়ঃ, মেষী চতুর্থী ইতি পশুচতুষ্টয়মিতি।'—ঐ, ৯. ৮. ৬।

স্তোত্র, শস্ত্র ও পশু অতিরাত্র যোগের অন্তর্ভুক্ত কিনা তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ একমত নহেন। রাত্রিকালের অনুষ্ঠানের পূর্বকৃত্য সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪. ৬) কেবল পঞ্চদশ স্তোত্র ও শস্ত্রের ব্যবস্থা দিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই ব্রাহ্মণ ষোড়শীকে অতিরাত্রের অংশরূপে স্বীকার করে নাই। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (২০. ১. ১ই[১]) দুই প্রকার অতিরাত্র স্বীকৃত হইয়াছে—একটিতে ষোড়শী থাকিবে, অপরটিতে থাকিবে না। কিন্তু কাত্যায়ন (৯. ৮. ৫) ষোড়শীর প্রয়োগ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তৈত্তিরীয়ের (৬. ৫. ১১) অনুবর্তী হইয়া আশ্বলায়নেরও (৫. ১১. ১) মতে ষোড়শী অবশ্যকর্তব্য কিনা বুঝা যায় না। অতিরাত্র অতি প্রাচীন যাগ। ঋগ্বেদে (৭. ১০৩. ৭) এই যাগ অতিরাত্র নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এটি যে একটি সারা রাত্রিব্যাপী মহাকোলাহলপূর্ণ সোমপান মহোৎসব তাহা এমনকি পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য হইতেও বেশ বোঝা যায়। Eggeling[২] বলেন, ঐতরে ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, অতিরাত্রে পর্যায়সমূহে শস্ত্রযাজ্যাদি বিধান এইরূপ যে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী অনুষ্টুপ্ এই চারিটি ছন্দের প্রথম তিনটি দিবসে ও অবশিষ্ট অনুষ্টুপ্ রাত্রিকালেই প্রযোজ্য। সেই জন্য উহা রাত্রি স্বরূপ। 'পান্তমা বো অন্ধসঃ' (৮. ৯২. ২) এই অন্ধস্ শব্দযুক্ত অনুষ্টুভে রাত্রির শস্ত্রের আরম্ভ হয়।

হোতাকে সোমলতা বা সোমার্থক এই অন্ধস্-শব্দযুক্ত, পানার্থক পা ধাতুনিষ্পন্ন পীতশব্দযুক্ত এবং মত্ততাজন্য হর্ষার্থক মদশব্দযুক্ত চারিটি অভিরূপ ত্রিষ্টুপ্দ্বারা প্রথম পর্যায়ের চারিটি চমসের যাজ্যা করিতেই হয়। ইহা হোতার অবশ্যকর্তব্য। আর ঋগ্বেদেও (২.১৯.১) আমরা ইহারই দ্যোতনা স্পষ্ট দেখিতে পাই—

---

১ তু°-লাট্যা-শ্রৌ° ৮. ১. ১৬ ; ৯. ৫. ২৩ (সভাষ্য)।

২ SBE. ×Li. p. ×viii.

"অপায্যস্যান্ধসো মদায় মনীষিণঃ সুবানস্য প্রয়সঃ।"

এখানেও 'পা' ধাতু, 'অন্ধস্' শব্দ ও 'মদ' শব্দ আছে। এখানে মত্ততার জন্য সোমপানও করা হইয়াছে। সুতরাং মনে হয়, অতিরাত্রের এই প্রথা প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছিল।

অতিরাত্রের কার্যাবলী বিচার করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অতিরাত্রের অনুষ্ঠান সমস্ত দিবস হইয়া পররাত্রিতে চলিতে থাকে। এই জন্যই বোধ হয় অতিরাত্র নামের সার্থকতা। লাট্যায়নও (৯. ৫. ৪) সম্ভবত এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ইহার শেষাংশকে 'যজ্ঞপুচ্ছ' বলিয়াছেন। আর এই পুচ্ছ মাসের শেষভাগ অতিক্রম করিয়া থাকে এবং ইহাতেই যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হয়।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (২০) এবং লাট্যায়নে (৯. ৫. ৬) অতিরাত্র এবং অপ্তোর্যামকে 'একাহ' না বলিয়া 'অহীন' শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম একাহ হইতে অহীনে পরিবর্তিত অবস্থার (transition) সূচনা করিয়া দেয়। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৩. ৪১), পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ প্রভৃতি অপ্তোর্যামকে সোমযাগ বলিয়াছেন, কিন্তু তৈত্তিরীয়-সংহিতা অপ্তোর্যামকে সোমযাগের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করে নাই। অপ্তোর্যাম অতিরাত্রের অধিকতর প্রবৃদ্ধি; অতিরাত্রকে আরও বাড়াইয়া অতিরাত্রে চারিটি অতিরিক্ত স্তোত্র ও শস্ত্র যোগ করিয়া দিয়া অপ্তোর্যাম অতিরাত্রকে অধিকতর প্রবর্ধিত করিয়াছে।* ব্রাহ্মণে (২. ৭. ১৪) ইহার প্রয়োগাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে অতিরাত্রের উৎপত্তি—কোন এক সময় দেবগণ দিনকে এবং অসুরগণ রাত্রিকে আশ্রয় করিয়াছিল। উভয় পক্ষই সমান বীর্যলাভ করিয়াছিলেন এবং পরস্পর কেহ কাহাকেও পরাভূত করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাতে ইন্দ্র অসুরদিগকে রাত্রি হইতে অপসারণ করিবার জন্য দেবতাদিগকে একযোগে আহ্বান করিলেন—

* বাজপেয় কদাচ প্রকৃত সোমযাগরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু কোন দেবতাই তাহার পক্ষ গ্রহণ করিতে সাহস করিলেন না, কারণ তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারকে মৃত্যুর মত ভয় করিতেন। এইজন্য এখনও লোকে রাত্রিকালে গৃহের বাহিরে আসিতে ভয় পায় এবং রাত্রিকে মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বলিয়া ভাবিয়া থাকে।

ইন্দ্রের আহ্বানে কেবল ছন্দেরা ইন্দ্রের অনুগমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ছন্দোগণসহ অতিরাত্র ক্রতুতে রাত্রির কর্ম নির্বাহ করেন। তাহাতে নিবিৎ বা পুরোরুক বা ধায্যা বা অন্য দেবতার উদ্দিষ্ট শস্ত্র পঠিত হয় নাই। রাত্রিতে অনুষ্ঠিত পর্যায়সমূহ দ্বারাই তাঁহারা যজ্ঞভূমি পরিক্রমণ করিয়া অসুরদিগকে নিরাকরণ করিয়াছিলেন। প্রথম পর্যায় দ্বারা পূর্বরাত্র হইতে, মধ্যম পর্যায় দ্বারা মধ্যরাত্র হইতে এবং শেষ পর্যায় দ্বারা শেষ রাত্র হইতে তাঁহারা অসুরদিগকে নিরাকরণ করিয়াছিলেন।

বৈদিকযুগে যজ্ঞে কতকগুলি যজ্ঞপাত্রের দরকার। সেগুলি সাধারণত বিকংকত কাষ্ঠ (flacourtia sapida) দিয়া তৈরী করিতে হয়। [বৈকংকতানি পাত্রাণি—কাত্যায়ন সূত্র, ১. ৩. ৩১]

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (৪র্থ অধ্যায়) নিম্নলিখিত যজ্ঞপাত্রের নাম পাওয়া যায়—জুহূ, উপভৃত, ধ্রুবা, অগ্নিহোত্রহবনী, কপাল, আজ্যপাত্রী, পুরোডাশপাত্রী, উপবেশ, ষড়বত্ত, ঔষধ, হোতৃষদন, শূর্প, অন্বাহার্যতণ্ডুল, শম্যা, ইড়াপাত্রী, অন্বাহার্যপাত্র, অভ্রি, প্রণীতা, আজ্যস্থালী, স্ফ্য, শৃতাবদান, অন্তর্ধানকট, উপসর্জনীপাত্র, যোক্ত্র, পূর্ণপাত্র, প্রাশিত্রহরণ, কুশমুষ্টি, ইধ্মবর্হিঃ, সন্নাহনাবচ্ছাদনতৃণ, বেদিতৃণ, হোতৃসমিৎ, সমিৎ, উলুখল, মুসল, উপল, পরিধি, বিধৃতি, পবিত্রস্বেদন, স্রুব, কৃষ্ণাজিন।
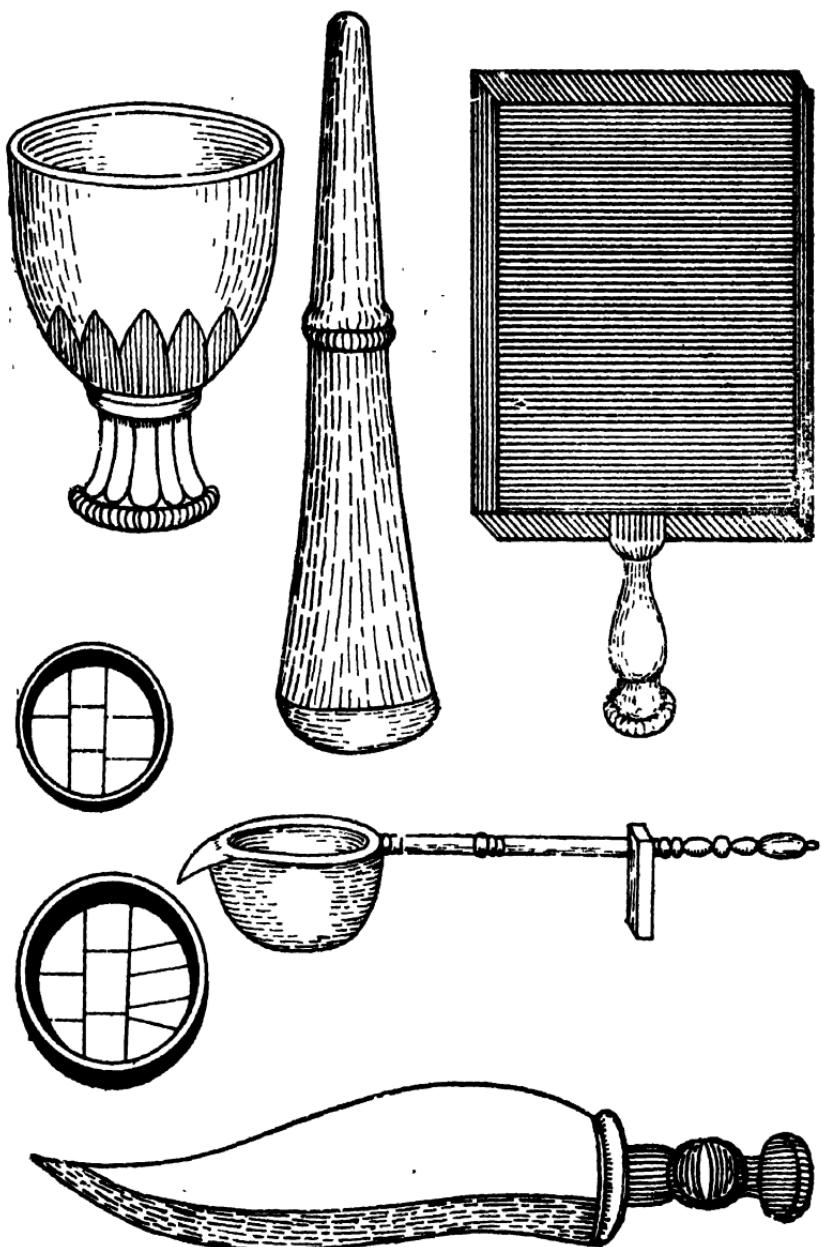
বৈদিক যজ্ঞে ব্যবহৃত কতিপয় দ্রব্য

বৈদিকযুগে শিক্ষার ধারা

বৈদিকযুগে শিক্ষার সূচনা হইত ঋষিদের তপোবনে এবং তাঁহারাই ছিলেন আদি গুরু। তপোবন বলিলে বুঝিবেন না যে তাহা শুধু ধ্যান-ধারণার স্থান ছিল। এখানে ঋষিরা বাস করিতেন, তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র থাকিত। গৃহস্থের যাহা কিছু কৃত্য সবই এই তপোবনে করিবার ব্যবস্থা ছিল। বৈদিকযুগে শিশুরা নিজেদের গৃহের মধ্যে যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করিত, তারপর তাহাদিগকে এই তপোবনে গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। তখনকার দিনে সকল পরিবারেই কত রকম ধর্মানুষ্ঠান হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। গর্ভে সন্তান-ধারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্তানকে উপলক্ষ করিয়া বিবিধ অনুষ্ঠান হইত। তারপর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জাত-কর্মাদির অনুষ্ঠান হইত। মাতাপিতা ও পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া শৈশবের শিক্ষা শেষ হইত। অতঃপর বাল্যের সঙ্গে সঙ্গে সে এক বৃহত্তর পরিবারে গুরুকুলে আশ্রয় লইত। সে যুগে প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছোট ছোট নগরের সংখ্যা বড় কম ছিল না, কিন্তু নগর লেখাপড়া শিখিবার যোগ্য স্থান ছিল না। চারিটি আশ্রম জীবনের মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গেই নগরের বেশী সম্বন্ধ ছিল। তাহার আগে জীবনের ভিত্তি গড়িতে হইত ঋষিদের তপোবনে। ব্রহ্মচর্যই ছিল সেই ভিত্তির উপকরণ। আর ছাত্রজীবন বলিলে ব্রহ্মচর্য কালই বুঝাইত। গুরুগৃহে এইরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত যাহাতে জীবন একটি সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জীবনের স্তরে স্তরে আধ্যাত্মিকতা ফুটাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা ছিল। এই শিক্ষার ফলেই তাহার মনে জীবন-সায়াহ্নে পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাব বিকশিত হইয়া উঠিত। গুরুদের মধ্যে আচার্যই

প্রধান ছিলেন। গুরুগৃহে বাসকালে গুরু শিষ্যের ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। গুরু নানা শ্রেণীর হইতেন—আচার্য, শ্রোত্রিয়, মহাশ্রোত্রিয়, কুলগুরু, শ্রমণ, তাপস এবং বাতরশন। আচার্য ও কুলগুরুর তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি ছাত্র থাকিত। এই ছাত্রেরা সাধারণত আশপাশ হইতে আসিত। কেহ দূর হইতেও যে না আসিত তাহাও নয়। পুরুষানুক্রমে বেদচর্চায় এবং ধ্যানে রাগাদি বৃত্তি বিদূরিত হইলে তিনি শ্রোত্রিয় নামে অভিহিত হইতেন। তাপসগণ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেন এবং যাহারা তাঁহাদের নিকট যাইত তাহাদের শিক্ষা দিতেন। ঋগ্বেদে বাতরশনদের যোগিসম্প্রদায়ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহারা কিরূপভাবে শিক্ষা দিতেন তাহা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উল্লিখিত আছে। ব্রাহ্মণরাই ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ক্ষত্রিয়দের কদাচ শিক্ষা দিতে দেখা যায়। ঋগ্বেদে, অথর্ববেদে, শতপথ ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, বৃহদারণ্যক উপনিষদে কয়েকজন ব্রাহ্মণেতর গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়। জনক, অজাতশত্রু, জৈবলি, শিলক, দাল্ভ্য এবং কৈকেয় ইহারা প্রসিদ্ধ গুরু বলিয়া খ্যাত। পরিব্রাজকদের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা নিজেদের মতবাদ প্রচারের জন্য সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিতেন। প্রকাশ্যে সকলের সমক্ষে অন্যের সহিত দার্শনিক মতবিচার করিতেন। পরাজিতকে জেতার মত গ্রহণ করিতে হইতে। জেতাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হইত। যাঁহারা বিখ্যাত বিজেতা হইতেন তাঁহাদিগকে কবি বা বিপ্র উপাধি দেওয়া হইত। এই রকম বিচারের উল্লেখ অথর্ববেদে আছে। সেখানে একজন হইতেন পার্শ্ব আর একজন হইতেন প্রতিপার্শ্ব ; প্রতিপার্শ্ব—প্রতিপক্ষ। শতপথ, তৈত্তিরীয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণেও এইরূপ বিচারের কথা আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দুইবার দুইরকম বিচারের উল্লেখ হইয়াছে। বৈদিকযুগে স্থবির, শ্রমণ ও চরকদের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর গুরু ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহারা

সকলেই বেদপন্থী ছিলেন। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ধর্মগুরু অর্থে স্থবির শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। প্রতিশাখ্যে সাকল্য পিতাকে স্থবির নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ইনি ঋগ্বেদের একটি শাখার প্রতিষ্ঠাতা। শতপথ ব্রাহ্মণে গুরু হিসাবে চরকদের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখা যায়, ইঁহারা বড় ভাল লোক ছিলেন না—পাপ কার্যে রত থাকিতেন। ইঁহারা ধড়িবাজ। সত্য সত্যই দড়ির উপরে আশ্চর্য রকমের নাচ ইঁহারা দেখাইতেন। তবে ইঁহাদের মধ্যেও ভাল লোক ছিলেন, পড়ান-শোনানতে পটুও বেশ ছিলেন। পাণিনি তাঁহার সূত্রে (৪. ৩. ১০৭) বৈদিক গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে দেখা যায়, ক্রমে বহু শঠ ও বঞ্চকেরা নিজেদের সকল জায়গায় গুরু বলিয়া জাহির করিতেছে।

প্রকৃত গুরুর গুণের কথা বহু স্থানে মেলে। তিনি ধীর, শান্ত, দান্ত। শিষ্য তাঁহার পুত্রতুল্য। শিষ্যের প্রতি তাঁহার স্নেহ যথেষ্ট। কিন্তু শিষ্য তাঁহাকে সব সময়ে ভক্তি করিবে এটুকু তিনি কখনও ভোলেন না। শিষ্যকে বুঝিতে হইবে, গুরুর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। তাঁহার প্রদত্ত সকল শিক্ষার, সকল উপদেশের তিনি জীবন্ত উদাহরণ। যিনি গুরু হইবেন তিনি যে কেবল শিষ্যকেই উপদেশ দিবেন তাহা নহে, তিনি জনসাধারণকেও শিক্ষা দিবেন—জ্ঞানের বাণী শুনাইবেন। ভিক্ষাই গুরুর জীবিকা ছিল। এক একজন গুরুর খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িত। শিষ্যের নিয়ম ছিল সে গুরুর নিকট কোন জিনিষ গোপন রাখিবে না। গুরুর পক্ষে, নিয়ম ছিল শিক্ষার সমস্ত বিষয় তাঁহার সম্পূর্ণ অধিগত থাকিবে। শিষ্য যখন গুরুর নিকট বিদায় লয় তখন গুরুর উক্তির এক অংশে দেখিতে পাওয়া যায়—গুরু অপেক্ষা মহৎ ব্যক্তির উপদেশ যেন শিষ্যগ্রহণ করে। গুরুর উদাহরণ শিষ্য মাত্র সেইটুকু গ্রহণ করিবে যাহা অনিন্দনীয়। শিষ্যকে উপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত হইতে হইবে। মুণ্ডকোপনিষদে মাত্র 'শিরোব্রত' নামক বিধির (discipline) পালনকারীকে শিক্ষা

দেওয়া হইবে, অন্য কাহাকেও নয়। প্রশ্নোপনিষদে পাওয়া যায়—ছাত্র যখন প্রথম গুরুর নিকট গিয়া দাঁড়ায় তখন গুরু তাহাকে আদেশ দেন যে তাহাকে একবৎসর শিক্ষা পাইবার জন্য শিক্ষানবিসী করিতে হইবে। সে একবৎসর তাহার কাজ হইত সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযম লাভের চেষ্টা। এই সারা বৎসর তাহাকে গভীর চিন্তায় কাটাইতে হইবে। কখনও কখনও শিক্ষানবিসীর কাল বাড়াইয়া দেওয়া হইত; উদ্দেশ্য—যে শিষ্য হইতে চায় সে শিষ্য হইবার উপযুক্ত কি না ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা। কেন না ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে বীজবপন বৃথা।

শিক্ষাপ্রার্থী হইতে হইলে তাহাকে অনেক বিষয় ওয়াকিবহাল হইতে হইত। গুরুর নিকট শিক্ষা প্রার্থনা করিতে হইলে প্রথমই তাহার হওয়া দরকার হইত—সুচরিত। ছাত্রের চরিত্রের দিকে দৃষ্টি পুরা মাত্রায় দরকার। তারপর তাহাকে শান্ত ও সুসমাহিত হইতে হইত।

শিষ্য সহিষ্ণু হইবে। তাহাকে অপ্রমাদরত ও তপোজ্ঞানশীল হইতে হইবে। শিষ্যের ব্রহ্মচর্যহানি হওয়া গুরুতর অপরাধ মধ্যে গণ্য। অজ্ঞাত শুক্রহানিরও প্রায়শ্চিত্ত ছিল।

শিষ্যের গুরুর প্রতি অচলাভক্তি থাকা চাই। গুরু কিন্তু তাহার চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করেন না। শিষ্য তাঁহাকে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারিত। গুরুও প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিতেন। তখনকার শিক্ষায় চিত্তের উন্মেষ হইত, উদ্ভিন্ন চিত্তকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য শিক্ষা ছিল না।

গুরুগৃহে বাস সাধারণত দ্বাদশ বর্ষের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। প্রয়োজন হইলে তাহা দ্বাত্রিংশ বা জীবনব্যাপীও হইতে পারিত। সাধারণ নিয়ম এই ছিল যে শিক্ষার্থী দ্বাদশ বর্ষে গুরুগৃহে আসিত এবং ছত্রিশ বৎসর বয়সে স্নাতক হইত। বর্ণানুসারে শিক্ষারম্ভের বয়সে তারতম্য ছিল। ব্রাহ্মণ সন্তানের শিক্ষা আরম্ভ হইত আট

হইতে ষোল বৎসরের মধ্যে। ক্ষত্রিয়ের এগার হইতে বাইশের মধ্যে। বৈশ্যের দ্বাদশ হইতে চতুর্বিংশ বৎসরের মধ্যে। বৃদ্ধ বয়সেও কেহ কেহ ছাত্র বা শিষ্যজীবন গ্রহণ করিতেন। আরুণি প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। শিক্ষায়তনের বৎসর আরম্ভ হইত বর্ষাকালে শ্রাবণী পূর্ণিমায়। শিষ্যের দেহ অশুচি বা অসুস্থ না হইলে অথবা স্থান অশুচি না হইলে নিত্যই পাঠ হইত। প্রাকৃতিক কারণ ঘটিলেও অনধ্যায় দিবস হইত। প্রতিপদ তখন অনধ্যায় দিবস ছিল না। দৈনন্দিন পাঠ চলিত। এই পাঠের নাম ছিল স্বাধ্যায়। এ ছাড়া আবৃত্তি ছিল তখনকার দিনে একটা অপরিহার্য ব্যাপার। আবৃত্তিকে 'প্রবচন' বলা হইত। স্বাধ্যায় ও প্রবচনকে তপঃ বলিয়া মনে করা হইত।

অথর্ববেদের যুগে ব্রহ্মচারীরা বড় বড় চুল রাখিত, মেখলা বন্ধন করিত, মৃগচর্ম পরিধান করিত এবং যজ্ঞকুণ্ডে অরণি-সংযোগে আহুতি দিত। তখন ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা ছিল। ছাত্রেরা যেভাবে জীবন অতিবাহিত করিত তাহার খুঁটিনাটির পরিচয় পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। উভয় যুগের পদ্ধতি প্রায় একরকম ছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬. ৩. ১০. ৫), শতপথ ব্রাহ্মণে (১১. ৫. ৪) উপনয়নকালে সকল কর্তব্যের বিবরণ পাওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণে (১. ২. ১-৮) ব্রহ্মচর্যের বিধিনিষেধের হৃদয়গ্রাহী বিবরণ আছে। অথর্ববেদের ন্যায় সুপ্রাচীনকালে উপনয়নকে দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া গণ্য করা হইত।

"আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং
কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।
তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি তং জাতং
দ্রষ্টুমভিসংযন্তি দেবাঃ॥"

—অ° ১১. ৫. ৩।

মেখলা-বন্ধনের সময় যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত

সেগুলি বলিয়া দিত যে, তাহার বন্ধনা শ্রদ্ধার কন্যা ও ঋষিদিগের ভগিনী। তাহার পবিত্রতা ও ব্রত-সংরক্ষণের শক্তি যথেষ্ট। বন্ধনী তাহাকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবে।

'শ্রদ্ধায়া দুহিতা তপসোঽধি জাতা স্ব স্ব ঋষীণাং ভূতকৃতাং বভূব।'—অ° ৬. ১৩৩. ৪।

আচার্যকে তখনকার সময়েও অধ্যাত্ম ব্যাপারে পূজা করা হইত।

তুঃ—'আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং
কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।'—অ° ১১. ৫. ৩।

অথর্ববেদে যে সকল মন্ত্র সমস্যাসূচক সেগুলি অনুসন্ধিৎসাদ্যোতক। যজুর্বেদের 'প্রশ্নী' ও অথর্ববেদের 'প্রবাচিক' সম্ভবত এক ধরণেরই ছিল। একাধিক সূক্তে অথর্ববেদে ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠি ও শ্রেষ্ঠির পৃষ্ঠপোষক বলা হইয়াছে। যজুঃ ও অথর্ববেদের সূক্তগুলি শিশুগণের ভবিষ্যৎ-নির্দেশক উপদেশে পূর্ণ। অথর্ববেদের ষষ্ঠ কাণ্ড হইতে দীক্ষার নিয়মগুলি বেশ স্পষ্ট।

ছাত্রদের মধ্যে তর্কযুদ্ধ হইত। যে ছাত্র অন্য ছাত্রদিগকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিত তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ 'কবি' বা বিপ্র উপাধি প্রদান করা হইত। অথর্ববেদে যে তর্ক আরম্ভ করিত তাহাকে 'প্রাশ' (opener) ও প্রতিপক্ষ যাহারা উত্তর দিত তাহাদের 'প্রতিপ্রাশ (opponent) বলিত।—অ° ১১. ৩; ১৫. ১; ২. ২৭; ১. ৭।

অথর্ববেদের সময় ছাত্রদিগকে কাজ করিতে হইত, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হইত, ভিক্ষা করিতে হইত ও আচার্যের গরু চরাইতে হইত—অ° ১১. ৫. ৪; ১১. ৬. ৯।

অথর্ববেদে উদ্ভিজ্জাদির ভৈষজ্য ব্যাপার বিশিষ্টভাবে উল্লিখিত আছে।

ছাত্রেরা পড়াশুনা শেষ হইলে আচার্য গৃহ হইতে স্বগৃহ গমন করিত। এইরূপ ছাত্রদের নাম ছিল 'স্নাতক'। অথর্ববেদে

ইহাদের জন্য নানাবিধ উপদেশ আছে। স্নাতকেরা মন সুস্থ ও দেহ নিরাপদ রাখিবে। দন্ত ও চক্ষুর জন্য তাহাদের বিশেষ যত্ন লইতে হইবে। অযথা উত্তাপ বা গোলমাল হইতে সতত বিরত থাকিবে। স্নাতকের মন সকল সময় আরাধনাপ্রবণ থাকিবে। বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য তাহাকে যথাসাধ্য চেষ্টা ও প্রযত্ন করিতে হইবে। বৈদিক আদর্শে সে তাহার চরিত্র গঠন করিবে। এইরূপ করিয়া সে সকলের শুভেচ্ছা ও প্রীতি অর্জন করিবে।

অথর্ববেদে চল্লিশের অধিক মন্ত্রে ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে উপদেশাদি আছে।[১] ছাত্রদের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশের কথা লইয়া এই বেদের আরম্ভ। এবং বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া বাহির হইবার কথা প্রসঙ্গে এই বেদের পরিসমাপ্তি।—অ° ১. ১; ১৯. ৭১-২।

অথর্ববেদের যে সমস্ত মন্ত্রে শিক্ষা-ব্যাপার নিবদ্ধ সেগুলিকে বিশেষত চারিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথমত, বৈদিক ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিবার সময় নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতে হইত; তদনুরূপ অনুষ্ঠানপূর্ণ মন্ত্র। দ্বিতীয়, বৈদিক পাঠ সমাপন ও বিদ্যামন্দির পরিত্যাগ। তৃতীয়, ছাত্রজীবন। চতুর্থ, শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয়।

শিষ্যকে সাধারণত সাতটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত। লঙ্ঘন করিলে তাহাকে পাপী বলিয়া মনে করা হইত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই নিয়মগুলি সবিস্তারে বলা হইয়াছে। শিষ্য মাংস খাইবে না। বিশেষ করিয়া জলচরের। সে আত্মসংযম ব্রত গ্রহণ করিবে। উচ্চাসনে বসিবে না। কখনও মিথ্যা বলিবে না। স্নানের জল সকল সময়ে ভাল হওয়া চাই। তাহাতে থুথু ফেলিবে না, বা প্রস্রাব করিবে না। ধর্মের নিয়ম তাহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। ধর্মানুশাসন অনুসারে তাহাকে ভোরে উঠিয়া দাঁত, নখ পরিষ্কার

---

১ অ° ১. ১; ১. ৯; ১. ৩০; ১. ৩৪ ইঃ। ১. ২৭; ২. ২৯ ইঃ। ৩. ৮; ৩. ৩১ ইঃ। ৪. ১; ৪. ৯; ৪. ১৩; ৪. ৩১ ইঃ।

করিতে হইবে। তারপর সন্ধ্যা করিতে হইবে। সন্ধ্যার ত্রুটি অমার্জনীয়। অপরিচ্ছন্ন লোকের সংসর্গ বর্জনীয়—তাহাদের কাছ হইতে সে কোন কিছু লইতে পারিবে না। বৈদিকযুগে discipline-এর স্থান শিক্ষারও উপরে ছিল। তখন জ্ঞানই চরম বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই—জ্ঞানের সাহায্যে যাহাতে পৌঁছিতে পারা যায় তাহাই ছিল লক্ষ্য—আর তজ্জন্য জ্ঞান উপলক্ষ্য। Disciplineকে বাদ দিয়া জ্ঞান সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাই চরিত্রগঠন জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে শিক্ষার একটি বিশেষ অংশ অধিকার করিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ অকপটভাবে সত্য প্রতিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ সে পরম সত্যের আরাধনার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না।

নিত্য সাবিত্রী উপাসনা, সন্ধ্যা প্রভৃতি অবশ্যকর্তব্য ছিল। সাবিত্রী উপাসনার সন্ধ্যা বন্দনায় একটি কথা তরুণ শিষ্যের মনের দ্বারে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত—গায়ত্রীমন্ত্রে তাহা বেশ পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেবী সাবিত্রীর মহাজ্যোতির ধ্যান করি—সেই ধ্যান হইতেই আমাদের মনের ও দেহের সকল ক্রিয়ার শক্তি সঞ্চয় করি। এই স্তুতি এই কথাই বলিতেছে যে বিশ্বের হৃৎপিণ্ডে যে শক্তির আশ্রয়, মানুষের সহিত তাহার অচ্ছেদ্য বন্ধন। যে অদ্বৈতভাব ভারতের সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে এখানে তাহারই স্ফূর্তি। আহারের সময় যে স্তুতি তাহাও ঐ একই ছন্দের দ্যোতনা—অন্নশক্তি বিশ্বশক্তির দ্যোতক, অন্নের জীবন সেই অক্ষয় জীবনের সূত্রে বাঁধা যাক্। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—এই পৃথিবীর সকল পদার্থ ই হয় খাদ্য নয় খাদক। উদক খাদ্য—অগ্নি খাদক ; আয়ু বা জীবন এই দেহের খাদ্য। পৃথিবী খাদ্য—আকাশ খাদক। এই উপনিষদেই আছে খাদ্য ও খাদক এক অপূর্ব বন্ধনে বদ্ধ। যাহার এই জ্ঞান লাভ হয় সে খাদ্য ও খাদকের সহিত এক হইয়া যায়। সে তখন মুক্ত। স্নানের মন্ত্রেও ঐ আশ্চর্য একত্ব। সমস্তই অদ্বৈতবাদের সুরে বাঁধা।

বৈদিকযুগের ধর্ম লইয়াই ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য। এ যুগের ধর্ম বলিলে প্রধানত যজ্ঞমূলক ধর্মই বুঝাইত। তাই এ যুগের সাহিত্যের সঙ্গে যজ্ঞের এত সম্পর্ক। বৈদিকযুগে যজ্ঞে তিনটি জিনিষ না করিলে চলিত না। প্রথম আবৃত্তি, তারপর গান, অতঃপর যজ্ঞানুষ্ঠান। কিভাবে হইবে তাহার পদ্ধতি এই তিনটি বিষয়েরই চরম উৎকর্ষ এই সময়ে হইয়াছিল।

আর্যরা স্পষ্ট প্রকাশভঙ্গী ও যথাযথ উচ্চারণের জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিত। দস্যুদের বাক্‌যন্ত্রের দোষ ছিল বলিয়া আর্যরা তাহাদের 'অনার্য' আর 'মৃধ্রবাক্' বলিত। আর্যদের উচ্চারণের সাত রকম রূপ ছিল। আর বাক্যের চারিটি পরিমিত পদ ছিল। কোন গ্রন্থ আবৃত্তি করিবার সময় তাহারা নানা প্রকার স্বরের ইতর বিশেষ করিত। একটা গোটা সূত্রই তৈরী হইয়াছিল বিশ্বামিত্রের আবৃত্তি নৈপুণ্যের বর্ণনা করিবার জন্য।

উচ্চারণের ক্রমোন্নতির বেশ সুস্পষ্ট ধারা বাহির করিতে পারা যায়। যজ্ঞে উচ্চারণ করিবার কাটা-ছাঁটা পদ্ধতির সুন্দর আভাস আছে। তিন রকম উপায়ে উচ্চারণ করা হইত।

ধর্মকর্মও তিন রকম উপায়ে অনুষ্ঠিত হইত। আর এই তিন রকম উপায় তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাতে ছিল—অর্কিগণ, হোতৃগণ ও ঋত্বিগ্‌গণ এই তিন সম্প্রদায়। ঋগ্বেদ যখন বর্তমান আকারে আসে নাই, তখন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ইহাদের হাতে ছিল। ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের গোড়ার পাঠে এই তিন রীতির উল্লেখ আছে। বর্তমান সঙ্কলিত পাঠে কিন্তু নাই।

যজুর্বেদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—যজ্ঞে যখন সাম ও যজুঃ প্রযুক্ত হয় তখন তাহার ফল হয় সাময়িক। কিন্তু ঋকের ফল স্থায়ী। এই ঋক্, যজুঃ ও সাম নিশ্চয়ই বৈদিক সঙ্কলনকে বুঝায় নাই। যজ্ঞে যে ঋক্ সূত্র আওড়ান হইত তাহাকেই বুঝাইয়াছে। অনুষ্ঠান-পদ্ধতির মন্ত্রকেই বুঝাইয়াছে। তারপর সামের কথা। সাম গীত হইত।

ব্রাহ্মণযুগে বাগ্-বিশুদ্ধি সংস্কৃতি ও সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত। কুরুপাঞ্চালের ভাষা পরিশুদ্ধ ভাষার আদর্শ হইয়াছিল। উত্তরাঞ্চলের ভাষাকে লোকে ভাল বলিত—আর বৈদিকযুগে ছাত্রেরা দলে দলে উত্তরে যাইত। বাহিরের লোকদের ভাষা আর্যরা ব্যবহার করিত না—তাহাদের ভাষা বলা নিষিদ্ধই ছিল। অপূত অপবিত্র ভাষা বলার জন্য কোন একটি আর্য পরিবারকে পৌরোহিত্য হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। খুব সংস্কৃত এমন লোকের পক্ষেও আর্যজুষ্ট উচ্চারণ করা কঠিন হইত। তাঁহারাও সহজে ধরিতে পারিতেন না। শিক্ষা-দীক্ষাওয়ালা লোকেদের ভাষা ব্রাত্যরা বলিত। ইহা তাহাদের পক্ষে ছিল—দীক্ষিতবাক্ কিন্তু খুব সোজা সোজা (অ-দুরুক্ত) উচ্চারণ করিতে তাহাদের বেগ পাইতে হইত। তাই সেগুলি তাহাদের নিকট দুরুক্ত ছিল। এমন কি আর্য ছাত্রদেরও ছেলেবেলার আবৃত্তি অভ্যাস করার প্রয়োজন হইত, ঠিক উচ্চারণ হইতেছে এইটিই তাহারা চাহিত। খুব ভোরে কাক-পাখী ডাকিবার আগেই তাহারা পুথি আওড়াইতে সুরু করিত। যাহারা চাষ বাস করিত তাহাদের উচ্চারণ বড় পাকা রকমের ছিল না। উচ্চারণ দোষাবহদুষ্ট হওয়ার জন্য ঋগ্বেদে তাহাদের ভাষাকে পাপপ্রসূ বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণযুগে ইহাদের যোদ্ধৃজাতি হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার কারণ, যোদ্ধৃজাতি লেখাপড়া করিত—একমাত্র অধ্যয়নেই তাহাদের জীবন কাটিয়া যাইত। তাহাদের বাগ্-ভঙ্গীর উৎকর্ষ তাহাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। বেদ-সংহিতার মধ্যে স্বরতত্ত্বের ক্রমবিবর্তনের একটা ইতিহাস বেশ ধরা যায়। স্বার্থক স্বরের, বিবর্তনের উপর একটি ঋক্ আছে। ঐতরেয় ও শতপথ আরণ্যক স্বরকে ঘোষ, উষ্ম ও ব্যঞ্জনে বিভক্ত করিয়াছে—দন্ত্য 'ন' ও মূর্ধন্য 'ণ' ভেদ রহিয়াছে 'শ, ষ, স' র পার্থক্য নিরুপণ করিয়াছে। সন্ধির নিয়মাবলীও বিচার করিয়াছে। উপনিষদে মাত্রা (quantity), বল (accent), শাম

(euphony) ও সুস্তানের (relation of words) প্রয়োগ নির্ধারণ করিয়াছে।

বৈদিকযুগে আবৃত্তির ধারা অনেক রকম ছিল। ঐতরেয় আরণ্যক আবৃত্তির মাণ্ডুক্যধারার (ভেকানুকারী ধারার) কথা বলিয়াছেন। উপনিষদ্‌যুগে পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা মাণ্ডুক্যধারা মানিয়া চলিত। পরবর্তী সময়ে একটি ঋগ্বেদী সম্প্রদায় ছিল তাহাদের নাম মাণ্ডুক্যায়ণ। পাণিনি ইহাকে মণ্ডুক থেকে ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। আরণ্যকে ঋগ্বেদ আবৃত্তি করিবার তিনটি পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে—সে তিনটির নাম প্রতৃন্ন, নির্ভুজ ও উভয়মন্তরেণ। এই রকম উচ্চারণ, আবৃত্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে।

আর্যদিগের প্রাচীনতমকালের প্রায় সমুদয় গ্রন্থই ছন্দোগ্রথিত। বেদের ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে সংস্কৃত-ভাষা-বিষয়ে ছন্দঃশাস্ত্র যে আবশ্যক তাহা উক্ত হইয়াছে। এই সময়ে শব্দশাস্ত্রেরও যে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল ঐ সকল গ্রন্থে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এদিকে বৈদিক সূত্রসমূহ এতই জটিল ও সূক্ষ্মাকারবিশিষ্ট যে, 'পরিভাষা' নামক পৃথক সূত্র ব্যতীত কেহই ইহার সম্যক্ অর্থগ্রহণে সমর্থ হন না। বিশেষত ইহাদের ব্যাখ্যায় 'অনুবৃত্তি' ও সূত্রেরও সাহায্য যথেষ্ট আবশ্যক। বোধ হয়, বিভিন্ন পথাবলম্বনবশত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যায় ধাতুপ্রত্যয়াদি-বিষয়ে ইতঃপূর্বেই শব্দের অর্থ লইয়া বেদশাস্ত্রকারদিকের মধ্যে নানা মতদ্বৈত উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যে কয়জন স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রকৃত পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে শব্দশাস্ত্রের আবিষ্কারক বলা যাইতে পারে। বোধ হয়, এইরূপে শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। আবার, অন্য দিকে ঐ সমস্ত বৈদিক গ্রন্থে পদসাধন ও শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে নিরুক্তের[১]

১ নিরুক্ত—১. ১৭, দুর্গাচার্যের টীকা।

উৎপত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে। ক্রমশ পদযোজনা-সম্বন্ধে বাদানুবাদের সূত্রপাত হয়। এইরূপে যখন ঋষিগণ দেখিলেন, বৈদিক গ্রন্থসমূহ ক্রমেই পরিবর্তিত, কোথাও পরিবর্ধিত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা সূত্রসকলের রক্ষার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। বৈদিক সূত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের জন্য একদিকে তাঁহারা শব্দ বিশ্লেষণ-ব্যাপারে নিরত হইলেন। পক্ষান্তরে, বোধ হয়, তাঁহাদের শব্দসকলের বিশুদ্ধ উচ্চারণের কোথাও ব্যতিক্রম হইয়া থাকিবে; তজ্জন্য তাঁহারা কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সমস্ত চেষ্টার ফলে বোধ হয় 'ব্যাকরণ' নামক 'বেদাঙ্গে'র উৎপত্তি হইয়াছিল। ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যের চতুর্দশ অধ্যায় পাঠ করিলে বিষয়টি স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। শব্দতত্ত্ববিৎ ডক্টর বার্নেল এই মতের পক্ষপাতী।[২]

বেদাঙ্গ বেদের অংশ নহে—বেদের পরিশিষ্ট। এই বেদাঙ্গের সাহায্যেই বেদের অর্থ সুগম হয়। এইগুলি অপৌরুষেয় নহে। সাধারণত ব্রাহ্মণকে 'প্রবচন' আখ্যা দেওয়া হয়—কিন্তু মনু বেদাঙ্গকে 'প্রবচন'[৩] নাম দিয়াছেন। ষড়্‌বেদাঙ্গের সর্বপ্রথম উল্লেখ সামবেদের ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে[৪] দেখিতে পাওয়া যায়। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে[৫] বেদাঙ্গের বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেদাঙ্গের কোন নাম দেন নাই। চরণব্যূহ, মনু[৬], মুণ্ডক ও ছান্দোগ্যোপনিষদে ছয়টি বেদাঙ্গের উল্লেখ আছে।[৭] কিন্তু বেদাঙ্গের

২ "On the Hindu School of Sanskrit Grammarians"—Burnell.

৩ "অগ্র্যাঃ সর্বেষু বেদেষু সর্বপ্রবচনেষু চ। শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ॥"—৩. ১৮৪।

৪ ৪. ৭।

৫ নিরুক্ত—১. ২০। ৬ মনু—৩. ১৮৫।

৭ ষড়্‌বেদাঙ্গ যথা—"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসঞ্চয়ঃ।
জ্যোতিষাময়নঞ্চৈব বেদাঙ্গানি ষড়েব তু॥"

অন্তর্গত বিষয়সকলের যথাযথ বিবরণ বৃহদারণ্যক ও তদ্‌ভাষ্যেই পাওয়া যায়। এই বেদাঙ্গ কোন ব্যক্তিবিশেষের গ্রন্থকে লক্ষ্য করিত না, ইহা ব্যাকরণশাস্ত্রকেই বুঝাইত। ঋগ্বেদের ভাষ্যে সায়ণাচার্য যেরূপে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যাকরণকে লক্ষ্য করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। দুর্গাচার্যের বচন[৮] হইতেও তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব-বেদের প্রাতিশাখ্যগুলি যেভাবে গ্রথিত, তাহাতে তাহাদিগকে এক একখানি বেদাঙ্গ-ব্যাকরণ বলা যুক্তিহীন নহে।

বস্তুত, পাণিনির পূর্ব হইতেই যে ব্যাকরণ বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য শব্দতত্ত্ববিৎ রোট, বার্নেল প্রভৃতি পণ্ডিতও এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে, একমাত্র অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর বেদাঙ্গ বলিতে কেন যে পাণিনির ব্যাকরণই বুঝিয়াছেন[৯] তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, তাঁহার এই মত যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহাতে সন্দেহ নাই। পাণিনির বহু পূর্বে যে ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অস্তিত্ব ছিল বৈদিক গ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। বৈদিক সাহিত্য কোন্ সময় বিদ্যমান ছিল তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সেগুলি পাণিনির বহু পূর্বের। বৈদিক সাহিত্যে পরিভাষাগুলি যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল এইরূপ কল্পনা করিবারও কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথম উদাহরণ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, "শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণাঃ স্বরাঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ।"—৭. ১.২।[১০] অতএব বর্ণ, স্বর ও মাত্রা এই

৮ "ব্যাকরণং অষ্টধা নিরুক্ত চতুর্দশধা" ইত্যাদি।

৯ Academy, July 1870.

১০ Bibl. Indica Edition, by Rajendralal Mitra, p. 725.

তিনটি পারিভাষিক শব্দ পাওয়া গেল। ছান্দোগ্য-উপনিষদে[১১] স্পর্শস্বর ও উষ্মবর্ণের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের[১২] "মহদ্ একবচনেন বহুবচনং ব্যবয়ামেঽতি", এই বাক্যে বৈয়াকরণিক একবচন ও বহুবচনের কথা দেখা যায়। অধ্যাপক বেবের শতপথ-ব্রাহ্মণের ১০১৮ পৃষ্ঠার টীকায় প্রমাণ করিয়াছেন, যে সময় এই ব্রাহ্মণ লিখিত হইয়াছিল সেই সময় ব্যাকরণ এত দূর উন্নত হইয়াছিল যে, ভূ অস্ প্রভৃতি ধাতুর ব্যাখ্যাও ইহাতে আলোচিত হইয়াছিল।

এই উক্তির সমর্থনের জন্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'মদ্' ধাতু (১. ১০ ; ২. ৩ ; ৩. ২. ২৯), 'সুধা'—সুহিত (৩. ৩৯. ১৭), জনুংষি=জাত-বৎ (৪. ৬ ; ২৯. ৩২ ; ৫.৫) প্রভৃতি উদাহণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[১৩] অক্ষর, অক্ষরপংক্তি, চতুরক্ষর, বর্ণকার, পদ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। গোপথ-ব্রাহ্মণ যদিও পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগুলির তুলনায় পরবর্তী, তথাপি ইহাতে অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে। ইহার ১.২৪ সূত্রে আছে—"ওঙ্কারং পৃচ্ছামঃ কো ধাতুঃ কিং প্রাতিপদিকং কিং নামাখ্যাতং কিং লিঙ্গং কিং বচনং কা বিভক্তিঃ কঃ প্রত্যয়ঃ কঃ স্বরঃ উপসর্গো নিপাতঃ কিং বৈ ব্যাকরণং কো বিকারঃ কো বিকারী কতিমাত্রঃ কতিবর্ণঃ কত্যক্ষরঃ কতি পদঃ কঃ সংযোগঃ কিং স্থানানুপ্রদানকরণং শিক্ষুকাঃ কিং উচ্চারয়ন্তি কিং ছন্দঃ কো বর্ণঃ ইতি পূর্বে প্রশ্নাঃ।" অতএব, ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ওঙ্কারের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ইহাতে প্রধান প্রধান পরিভাষার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সামবেদের তাণ্ড্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতেও বৈয়াকরণিক অর্থদ্যোতক বহু পরিভাষার নাম পাওয়া যায় ; এখানে সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

১১ ছান্দোগ্য-উপনিষদ্—২. ২২, ৩. ৫।

১২ D. A. Weber's Edition, p. 990.

১৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অধ্যায়—১. ২. ৫।

'শিক্ষা' বৈদিক সূত্রের প্রকৃত উচ্চারণ ও যথাযথ আবৃত্তি-বিষয়ে শিক্ষা দেয়। অধ্যাপক হৌগ (Haug) বলেন, শিক্ষা প্রাতিশাখ্য অপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহার বিধি-ব্যবস্থা পরে প্রাতিশাখ্যের নিয়মাদির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। ডক্টর বার্নেলও তাহাই বলেন। কেহ কেহ এই শিক্ষাগ্রন্থের এতাদৃশ প্রাচীনত্ব-বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন। সকল শিক্ষা-গ্রন্থই যে প্রাচীন তাহা নহে। সমুদয় শিক্ষা-গ্রন্থ এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই; তবে, সম্প্রতি অধিকাংশ গ্রন্থই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে 'অমোঘনান্দিনী শিক্ষা'[১৪] 'কেশবী শিক্ষা'[১৫], 'শিক্ষাসমুচ্চয়'[১৬] ও শ্রীনিবাস-কৃত 'সিদ্ধান্ত-শিক্ষা'[১৭] যে নিতান্ত অর্বাচীন তাহা পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করেন। তবে, 'গৌতমী'[১৮], 'নারদ'[১৯], 'মণ্ডুকী'[২০], ও 'লোমশনী শিক্ষা'[২১] যে অতি প্রাচীন সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, এই শিক্ষাগুলি ব্যাকরণ-শ্রেণীর অন্তর্গত নহে—তবে এগুলিতে উচ্চারণ ও আবৃত্তি, ব্যাকরণের এই দুইটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে মাত্র। অতঃপর প্রাতিশাখ্যেই ব্যাকরণের অনেক কথার

১৪ Rajendralal Mitra : "Notices", I. p. 72

১৫ Rajendralal Mitra : "Report", p. 18.

১৬ Mysore Cat. No. 57. ১৭ Mysore Cat. No. 51. p. 8.

১৮ Haug : Ueber das Wesen U. S. W. P. N. K.—ইহা তামিলদেশে রক্ষিত।

১৯ A. C. Burnell : Notices, I. p. 73. অধ্যাপক হৌগের মতে ইহার দুই প্রকার মূল বিদ্যমান আছে।

২০ Haug : U. S. W. P. N. K., p. 52 ; Weber : 'Pratijna-Sutra, p. 106f ; "Notices", I. p. 73.

২১ "Report", p. 18 ; Haug : U. S. W. P. N. K., p. 61 ; "Notices", I. p. 71.

আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দসকলের উচ্চারণ, উচ্চারণাদির লঘু-গুরু-ভেদ, প্রত্যেক অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণ-সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধি, প্রকৃতি, কার্যকারিতা, দুই বা ততোধিক শব্দের সন্ধি-বিধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস প্রভৃতি এই প্রাতিশাখ্যগুলির আলোচ্য বিষয়। বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ-বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য এই প্রাতিশাখ্যগুলি রচিত হয় নাই। এইগুলিতে শব্দ বা ধাতুর প্রকৃত্যাদির আলোচনাও নাই। তবে, এগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কথিত ভাষা ও সঙ্গীতে কিরূপ উচ্চারণ পার্থক্য ঘটে তাহা দেখিবার জন্য অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণাদির বিস্তৃত বিধিব্যবস্থা দিবার জন্যই এইগুলি রচিত হইয়াছিল। ঋক্ সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চারি বেদের চারিটি প্রাতিশাখ্য আছে। ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যই[২২] সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে বর্ণ, উচ্চারণ, প্রযত্ন প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। যথা—"অথ বর্ণ সমান্নায়ঃ।"..."দ্বে দ্বে সবর্ণে হ্রস্বদীর্ঘে।" "নপ্লুতপূর্বম্।" "ষোড়শাদিতঃ স্বরাঃ।" "শেষা ব্যঞ্জনানি।" শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য ও বেদাধ্যয়ন-বিষয়ে অনেক আনুকূল্য করিয়াছে। ইহার অপর নাম কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্য।[২৩] এখানি অতি প্রাচীন কালের রচনা। তবে ইহা যে পরবর্তী কালে বিশেষ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল তাহা সহজেই বলিতে পারা যায়। সংজ্ঞা, পরিভাষা, শব্দের উচ্চারণের নিয়ম, সন্ধি, ক্রিয়ার উপর যতিপাতের নিয়ম ও উচ্চারণের নিয়ম, স্বর-ব্যঞ্জনের তালিকা, গ্রন্থপাঠের নিয়ম প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় ইহাতে

---

২২ ভোজদেবের সমসাময়িক বজ্রাতের পুত্র উয়টভট্ট 'পাষদব্যাখ্যা' নামে ইহার টীকা রচনা করেন।

২৩ উয়টভট্ট ইহার টীকা করিয়াছিলেন। 'জ্যোৎস্না' নামক রামচন্দ্র-কৃত আর একটি টীকাও বর্তমান আছে, তবে সেটি আধুনিক।

আলোচিত হইয়াছে।[২৪] সাধারণত আটজন বৈয়াকরণের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি-নিবাসী বোপদেব তাঁহার 'ধাতুপাঠে'র উপক্রমণিকার দ্বিতীয় শ্লোকে এই আটজন শাব্দিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলিঃ শাকটায়নঃ। পাণিন্যমর-জৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥" দুর্গাচার্যও তাঁহার যাস্কের টীকায় বলিয়াছেন, 'ব্যাকরণং অষ্টধা' (১. ২)। এই আটজন শাব্দিকের মধ্যে পাণিনির ব্যাকরণই সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। শাকটায়ন ও জিনেন্দ্রের হস্তলিখিত পুঁথি আজও বর্তমান আছে। তিব্বতীয় ভাষায় 'চন্দ্রব্যাকরণ' অদ্যাপি সুরক্ষিত

---

২৪ যথা—ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য— ১। ক-কার, ইত্যাদি (৪. ৬)। ২। ই, উ, এ ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা)। ৩। কথৌ ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা) দ। ৪। রেফ (১. ১০)। ৫। শ-কারচ-কারবর্গয়োঃ (৪. ৪)।

তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য—১। অ-কার (১. ২১); ইকার (২. ২৮); হ-কার (১. ১৩); অ-বর্ণ (৭. ৫); ই-বর্ণ ইত্যাদি (১০. ৪)। ২। প (৪. ৩০); ন (৪. ৩২); ক্ষ (৯. ৩)। ৩। ত, ট (৭. ১৩); ১, খ (৭. ১৭); র (১. ১৯)। ৪। রেফ (১১.১৯)। ৫। ক-বর্গ (২. ৩৫); চ-বর্গ (৩. ৩৬); ট-বর্গ (১৪. ২০)।

কাত্যায়নীয় প্রাতিশাখ্য— ১। -কার, ঔ-কার (১. ৭৩); ঌ-কার (১. ৭৩); ই-বর্ণ (১. ১১৬)। ২। উবোষ্পর্ণঃ (১. ৭০); অ (১. ৭১)। ৩। র (১.৪০); ৪। নুঃ (১৩. ১৩২)। [ইহা 'ন' স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে]। ৫। ত-বর্গ (৩. ৯২)।

এই প্রাতিশাখ্যে পাণিনির 'এৎ' প্রভৃতির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি যে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট কারণও আছে।

অথর্ব-প্রাতিশাখ্য—১। অ-কার (১. ৬), ঌ-কার (১. ৪), ল-কার (১. ৫), য়-কার (১. ২৩)। ২। ঋ-বর্ণ (১. ৩১)। ৩। য, র (১. ৬০), শ ষসেষু (২. ৬)। ৪। রেফ (১. ২৮)। ৫। চ-বর্গ (১. ৭), উবর্গীয়ে (২. ১২), চটবর্গয়র (২. ১৪) ইত্যাদি।

আছে।[২৫] ইন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলি ও অমরের নাম সূত্রাদির উদ্ধৃত বচনে দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রই আদি ব্যাকরণ-প্রণেতা ছিলেন, এই মতই বিশেষ প্রচলিত। সারস্বত ব্যাকরণের ভাষ্যে ইন্দ্র আদি বৈয়াকরণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। "ইন্দ্রাদয়োঽপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ। প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথম্॥" (বোম্বাই-সংস্করণ, শ্লোক ২)। উত্তর দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও ইন্দ্র-ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবদান-শতকে লিখিত আছে, সারিপুত্ত বাল্যকালে ইন্দ্রব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।[২৬] তিব্বতীয় সাহিত্যে ইন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ বহুবার দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, সর্বজ্ঞ-(শিব-) কর্তৃক প্রথম ব্যাকরণ প্রণীত হয়। কিন্তু এই ব্যাকরণ তিনি কখনও জম্বুদ্বীপে প্রেরণ করেন নাই। তৎপরে ইন্দ্র ইন্দ্রব্যাকরণ প্রণয়ন করেন ও বৃহস্পতি তাহা অধ্যয়ন করেন। ইহা জম্বুদ্বীপে প্রচলিত ছিল। অতঃপর পাণিনি-ব্যাকরণ এই স্থানে সবিশেষ প্রচলিত হয়।[২৭] 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ও 'কথাসরিৎসাগরে' লিখিত আছে যে, পাণিনি-ব্যাকরণের আবির্ভাবের পর হইতেই ইন্দ্রব্যাকরণের চর্চা লোপ পাইতে থাকে।

১৬০৮ খ্রী°[২৮] তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথ একখানি ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তারনাথের মতে,

২৫ Schiefur: Neber die logischen and grammatischen Werke in Tandjur.

২৬ Burnouf: Introduction i. p. 456. "a´ Seize ansil avait lu la grammaire d'Indra et vaineau tods cense quiudis-putaient avec lui"; Wassılycurs, Der Buddismus, p. 332.

২৭ Wassiljew in Schiefner's translation of Taranatha's Tibetan History of Indian Buddhism, p. 294.

২৮ Do. German translation, p. 54.

সপ্তবর্মা[২৯] (সর্ববর্মা?) ষণ্মুখকে (কার্তিকেয়কে) ইন্দ্রব্যাকরণ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে বলেন। তৎশ্রবণে কার্তিকেয় বলেন—"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়।" এইটুকু শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যাকরণের অবশিষ্ট অংশ বুঝিয়া ফেলিলেন। উদ্ধৃত সূত্রটি প্রকৃতই কাতন্ত্র বা কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। এছাড়া ইহা ইন্দ্রব্যাকরণের অন্তর্গত। তারনাথ সপ্তবর্মাকে কালিদাস ও নাগার্জুনের সমকালিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি বলেন, পাণিনি-ব্যাকরণের সহিত ইন্দ্র-ব্যাকরণের, কলাপ-ব্যাকরণের সহিত চন্দ্রব্যাকরণের[৩০] ঐক্য

---

২৯ সংস্কৃত পুথিতে 'সর্ববর্মা' দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তারনাথ স্পষ্ট বলিয়াছেন, 'সর্ববর্মা' ও 'ঈশ্বরবর্মা' এই দুইটিই ভুল।

৩০ চন্দ্রাচার্যের অপর নাম চন্দ্রগোমি। ইনি মহারাজ কনিষ্কের পরে পূর্বাঞ্চলে 'বরেন্দ্র'-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত বাংলা এই স্থানটি—বাকলা। ভর্তৃহরি-কর্তৃক 'চন্দ্র-ব্যাকরণে'র নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতের কোথাও চন্দ্রব্যাকরণের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পাওয়া যায় না। কাশ্মীরপ্রদেশে ডক্টর বুলার চন্দ্রব্যাকরণের 'বর্ণসূত্র' (শিক্ষা) ও পরিভাষাসূত্র ১৮৭৬ খ্রী° প্রাপ্ত হন। তিব্বতীয় ভাষায় চন্দ্রব্যাকরণের উণাদি-বৃত্তি ও উপসর্গ-বৃত্তি সংরক্ষিত আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থকার ভিক্ষু স্থিরমতি নেপালের মধ্যবর্তী পটেন নগরে অবস্থানকালে (৯৫০—১০০০খ্রী°) চন্দ্রব্যাকরণের অন্তর্গত 'ধাতুপাঠ' ও 'অধিকার-সংগ্রহ' তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এতদ্ভিন্ন ধর্মদাসের 'সূত্রবৃত্তি' ও 'গণপাঠ', আনন্দ দত্তের 'সূত্রপদ্ধতি', পূর্ণচন্দ্রের 'ধাতুপারায়ণ' এবং কায়স্থ চন্দ্রদাসের 'সমন্ত-উদ্দেশ'ও (চন্দ্রবৃত্তি) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত চন্দ্রব্যাকরণের সম্পূর্ণ 'সূত্রপাঠ' পাওয়া গিয়াছে। পূর্বে সিংহলে চন্দ্রব্যাকরণ পঠিত হইত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রায় ১২০০ অব্দে সিংহলের বৌদ্ধ যতি 'কাশ্যপ' সংস্কৃত শিক্ষা-সৌকর্যার্থ 'বালাবোধন' নামক সরল ব্যাকরণ রচনা করেন। সিংহলের সর্বত্র ইহার প্রচার হওয়াতে চন্দ্রব্যাকরণের অধ্যয়ন সিংহলে বন্ধ হইয়া যায়। কাশ্যপের ব্যাকরণ অনেকটা 'লঘুকৌমুদী"র মত। জয়াদিত্য ও বামনের 'কাশিকাবৃত্তি'তে চন্দ্রব্যাকরণের মত সমালোচিত হইয়াছে।

আছে। যক্ষবর্মা শাকটায়ন-ব্যাকরণের টীকায় ইন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য ঋগ্বেদের ভাষ্যে যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রকে আদি বৈয়াকরণ বলা যাইতে পারে। এইরূপে ইন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ বহু গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও অধুনা ইন্দ্রব্যাকরণের কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি এই পর্যন্ত বলা যাইতে যে, পাণিনির পূর্বে পাণিনি ব্যাকরণের ন্যায় এই ব্যাকরণের সুবিস্তৃত প্রচলন ছিল। পাণিনির পূর্বের দু'চারখানি ব্যতীত প্রায় সমস্ত ব্যাকরণই ইন্দ্রব্যাকরণ নামে অভিহিত হইত। তিব্বতে কলাপ-ব্যাকরণকে ইন্দ্রব্যাকরণ বলিত। বোধ হয়, পাণিনির পূর্বে ইন্দ্রব্যাকরণ-অনুযায়ী যিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিতেন তাহারই নাম 'ঐন্দ্র' রাখা হইত।

মহাকাব্যযুগে শিক্ষার ধারা

বৈদিকযুগে যে ধারায় শিক্ষা চলিয়াছিল তাহাই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া সূত্রযুগে পৌঁছিয়াছিল। সূত্রযুগের শিক্ষা-পদ্ধতি রামায়ণ ও মহাভারতকালে একরূপ অক্ষুণ্ণই ছিল। গৃহ্যসূত্রগুলিতে ছাত্র-জীবনের চিত্র বেশ উজ্জ্বল, সম্যক্ পরিস্ফুট। এই সূত্রগুলিতে চতুরাশ্রমের প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক সময়ের কার্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক উপদেশ আছে। ছাত্রজীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির একটুও বাদ পড়ে নাই।

সন্তান জন্মের পর দেড়মাস কাল মাতা অশুচি থাকেন। এই সময়ে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। শিশুকে এই সময়ে অতি সাবধানে রাখা প্রয়োজন। জাতকর্মের পর মাতা ও শিশু শুদ্ধ হন। নিক্রমণের সময় শিশুকে উন্মুক্ত স্থানে আনিয়া বিশ্বপ্রকৃতির সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হয়। একবর্ষ পূর্ণ হইলে উন্মুক্ত স্থানে চাঁদের আলোতে শিশুর অন্নপ্রাশন হয়। তিন বা পাঁচ বর্ষ বয়সে তাহার চূড়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বিদ্যালয়ের সহিত তাহার পরিচয়। এই বিদ্যালয় হইতেই তাহার খুব বাঁধাধরা জীবনের আরম্ভ হয়। ভোর হইতে না হইতেই তাহাকে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে হয়। তারপর সকল কাজ একটা বাঁধাধরা নিয়মের উপর করিতে হয়। দাঁতমাজা নিয়মিত হওয়া চাই। এখন হইতে ধর্মকথা উপকথাচ্ছলে তাহার মনে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। আর এই সময় হইতেই সহজ ধর্মভাব তাহার মন অধিকার করে। ইহার মূল্য যে কত আজিকার দিনে তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি হইতেছে।

গৃহে এই প্রথম জীবনে শিশু মাতার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করে যে, প্রকৃতির সকল কিছুর সহিত তাহার আন্তরিক ঐক্য

প্রয়োজনীয় সকল উপদেশই দেওয়া হইত। দারিদ্র্য, ব্রহ্মচর্য, দয়া ও নম্রতার ব্রত গ্রহণের জন্যই এই ব্রহ্মচারীর জীবন। সবিতার নিকট প্রার্থনা করা হইত, জীবন যেন সার্থক হয়। এই সবিতৃ-উপাসনা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বর্ণানুসারে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দে গাহিয়া গাহিয়া করিতে হইত।

এই দীক্ষার নাম ছিল উপনয়ন। বৈদিকযুগে ইহার অস্তিত্ব থাকিলেও ব্রাহ্মণে উপনয়নের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই রকম আচারের ব্যবস্থা অবেস্তায়ও আছে। অবেস্তায় দীক্ষার বয়স কিছু বেশী এবং গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ ১৮ মাস হইতে ৩ বৎসর পর্যন্ত।

শিষ্যকে ভিক্ষা করিতে হইত। গুরুর প্রয়োজনীয় সকল জিনিষও সংগ্রহ করিতে হইত। তাহাকে এমনিভাবে জীবন যাপন করিতে হইত যাহাতে তাহার জিহ্বা, হস্ত এবং উদর তাহার বশে থাকে। তাহাকে সতত সাবধানে থাকিতে হইত। বেশী কথা, পরনিন্দা, দ্যূত, নিষিদ্ধ খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে সে সকল সময়ে অবহিত থাকিত। নৃত্য, উৎসব, জনতা ইত্যাদি তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ স্থান ছিল। কিন্তু সকলে সকল সময়ে এত খুঁটিনাটির ব্যাপারে নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিত না। ত্রুটি হইয়া পড়িত। সেগুলি ক্ষন্তব্য ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্যের চ্যুতি ঘটিলে তাহার নিস্তার ছিল না। একটি গর্দভ বলি দিয়া তাহাকে ঐ গর্দভের চর্ম পরিধান করিতে হইত। তাহার উপর লেজটি ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া পূর্ণ এক বৎসর তাহাকে নিজ পাপ ঘোষণা করিয়া ভিক্ষা করিতে হইত। এই সময় ব্রহ্মচর্যই শিক্ষার ভিত্তি ছিল। বেদের ন্যায় বেদান্ত ও সকল গৃহ্যসূত্রই ব্রহ্মচর্যকে শিক্ষার ভিত্তি বলিয়াছে। বেদাধ্যয়নের কালও নিরূপিত ছিল। মনের উৎকর্ষ যেমন লক্ষ্য ছিল, দৈহিক ব্যায়াম-প্রাচুর্যও তাহার শিক্ষা-জীবনে দেখা যাইত। শিক্ষার নীতি এই ছিল যে কামোত্তেজক বিলাসিতার নামগন্ধ শিক্ষা-জীবনে থাকিবে না।

প্রচুর অনধ্যায় দিবসের পরিচয় পাওয়া যায়। আরম্ভে ও শেষে তিন রাত্রি, অষ্টকে ও ঋতুশেষে একদিন ও এক রাত্রি অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। প্রতিপদ, চতুর্দশী ও পূর্ণিমায় অধ্যয়ন হইবে না। মেঘাকুল আকাশ ও বজ্রগর্জনে দেড় দিন পাঠ বন্ধ। শিষ্যের অপবিত্রতার কারণ স্থানীয় রোগ বা মৃত্যু ঘটিলে অনধ্যয়ন।

বহু প্রকারের শিক্ষকের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষকের গুণ-নির্দেশক বচনও অনেক পাওয়া যায়। গুরুর দায়িত্ব যে কত বেশী বার বার তাহা বলা হইয়াছে। আচার্যই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি শিক্ষার জন্য কোন বেতন বা অর্থ গ্রহণ করিবেন না। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে বিদ্যাদানের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ রূপ নিয়মের পরিচয় কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই। গুরু আচার্যের সমান বিদ্বান্—তিনি শিষ্যের নৈতিক উন্নতির জন্য বিশেষ মনোযোগী। উপাধ্যায়কে কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের জন্য হয়তো সামান্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইত। আর যাঁহার নাম শিক্ষক তিনি নৃত্যাদি শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা বিষয়ে যে কোন গোঁড়ামি ছিল না তাহা বেশ বুঝা যায়। পাণিনি গুরুর যে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন তাহাতে আস্তিক, নাস্তিক, ও দৈশিক সকলেই গুরু হইতে পারিতেন। বিদ্যার জন্য নাস্তিক গুরুকরণে কোন বাধা ছিল না। সন্দেহবাদী বিদ্বান্ দৈশিক গুরুরও শিক্ষাদানে অধিকার ছিল। গুরুও শিষ্য গ্রহণ করিতেন পরীক্ষা করিয়া। সকল শিক্ষা যে সকলে গ্রহণ করিতে পারিবে এমন বিশ্বাস তাঁহাদের ছিল না। পাত্র-ভেদে যে শিক্ষার বিভিন্নতা হইবে, এ বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান ও ধারণা ছিল। উচ্চশিক্ষা যে সকলে গ্রহণ করিবার যোগ্য নয় তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই জানিতেন। কাহাকে কাহাকে উচ্চশিক্ষা দিতে হইবে মনুতেও তাহার ব্যবস্থা আছে। নারী এবং শূদ্রেরা সাধারণত উচ্চশিক্ষায় যোগ্য নয় বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। নারীর মস্তিষ্ক নরের অপেক্ষা সাধারণত আধ পোয়া কম। তাহার

বুদ্ধি-বিষয়ক শিক্ষা পুরুষের সঙ্গে এক হইতে পারে না। তাহাদের জীবনও তাহাতে বিশেষ বাধা দিবে। সেকালে শূদ্রের সংস্কৃতির অভাব স্বীকার করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তখনও বিদুষী নারী ও জ্ঞানী শূদ্রের মাঝে মাঝে পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-সাহিত্যে তাহাদের বিশেষ পরিচয় ঘটে। হিন্দুশাস্ত্রেও আছে নীচ কুলের ব্যক্তির নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে পারা যায়। বিদুরকে গুণিজন-শ্রদ্ধেয় বলিয়া মহাভারত পরিচয় দিয়াছেন।

গুরু শিষ্যের পিতৃস্থানীয়। তাহারা পরস্পরকে রক্ষা করিবে, তাই শিষ্যকে বলা হইয়াছে ছাত্র।

অশ্রদ্ধেয় লোকে জীবিকা-নির্বাহার্থ গুরু হইয়াছেন এরূপ উদাহরণও পাওয়া যায়। আবার সাংসারিক কোন সুবিধার জন্য অথবা বিশেষ কোন লাভের জন্য ছাত্র বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে এমন লোকেদেরও কথা শোনা যায়। তীর্থকরেরা বারংবার গুরু বদল করিত। ওদপাণিনীয়রা পাণিনি পাঠ করিত শুধু জীবিকার জন্য। ঘৃত-রন্ধ্য এবং কম্বলচারায়ণীয়রা ঘৃত বা কম্বল লাভের জন্য ছাত্র হইত। কেহ কেহ আবার ছাত্র-জীবন পূর্ণ হইবার পূর্বেই শিক্ষা ত্যাগ করিত। যাহারা এরূপ করিত, তাহাদের বলা হইত খট্বারূঢ়।

অযোগ্য গুরু ত্যাগে কোন বাধাও ছিল না। গুরুর বিদ্যার অভাব বা তাঁহার অনাচারে তাঁহাকে ত্যাগ করা হইত। শিষ্যকে মাত্র নিজের সুবিধার জন্য যদি গুরু অবজ্ঞা করেন এবং তজ্জন্য শিক্ষাদানে ত্রুটি ঘটে, তিনি যদি শাস্ত্রানুসারে বিদ্যানুশীলনে অবহেলা করেন, যাগযজ্ঞবিষয়ে অমনোযোগী বা কোন ঘোর পাপ করেন, তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধা নাই। বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণেও বাধা ছিল না।

বহু শিষ্য গুরুর গৌরবের কারণ বলিয়া গণ্য হইত। উপনিষদের

যুগ হইতেই বহু শিষ্যের জন্য প্রার্থনার দৃষ্টান্ত বহু বার পাওয়া গিয়াছে। রাজা, ধনী ও সর্বসাধারণ সকল সময়েই শিক্ষার পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়াছেন, আর এই জন্যই বোধ হয় এ দেশে চিরকাল অবৈতনিকভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। কিন্তু শিক্ষানীতি সম্বন্ধে পৃষ্ঠপোষকদের কোন হাত ছিল না। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'। এই ব্যাপারটা আমরা বেশ বুঝি, যখন দেখি ভারতবর্ষে রাজা মাত্র একজন বিচারক। স্মৃতি বা আইন তিনি গড়েনও না, ভাঙেন না। রাজা তুলাদণ্ডে বিচার ব্যবস্থা করেন মাত্র। শ্রুতি ও স্মৃতির তিনি পালক মাত্র, স্রষ্টা নহেন ; পশ্চিমের সকল দেশে রাজা বিধি-সৃষ্টি করেন ; সেই বিধিকে রাজার বিধি বলা হয়। রাজাকে বিধির উপরে জ্ঞান করা হয়। তিনি ইচ্ছামত বিধি ভাঙিতেও পারিতেন, নব বিধি সৃষ্টি করিতেন। সাধারণের শিক্ষা হইতে রাজার ছেলেদের শিক্ষায় কিছু পার্থক্য ছিল। সেরূপ থাকাও স্বাভাবিক। রাজার জীবনের উপযুক্ত হইবার বিশেষ শিক্ষাই রাজপুত্রদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

কৌটিল্য একটি পাঠ্য তালিকা দিয়াছেন ; তাহা প্রধানত রাজপুত্রদের জন্য। উপনয়নের পরেই ত্রিবেদ শিক্ষার আরম্ভ হইত। এখানে বেদ বলিলে বেদের ব্যাখ্যা এবং বেদ-সংযুক্ত অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞান বুঝাইত। এইরূপ শিক্ষাকেই দিব্যাবদানে নিঘণ্টু ও কেটুভ বলা হইয়াছে। তারপর শিষ্ট ব্যক্তির অধীনে আন্বীক্ষিকী পাঠাভ্যাস। আন্বীক্ষিকী বলিলে সাংখ্য, যোগ, লোকায়ত এবং সাধারণ দর্শন-শাস্ত্র, মনসংযম ও পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রভৃতি বুঝাইত। কৌটিল্য এই শিক্ষার উপর জোর দিয়াছেন। ইহাতে সর্ববিষয়ে ধারণাশক্তি বাড়ে এবং এই শিক্ষার পরে, অন্য কোন বিশেষ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা কঠিন হয় না। অতঃপর রাজপুত্রদের বিশেষ করিয়া শিক্ষার বিষয় ছিল বার্তা এবং দণ্ডনীতি। বার্তার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—কৃষি-জ্ঞান, গৃহ-পালিত পশু-তত্ত্ব

(বিশেষত কি প্রকারে উত্তম উত্তম শাবক সৃষ্টি করা যায়) এবং পণ্য দ্রব্যতথ্য। এই সকল বিষয়ের সেই সময়কার কোন বই আজকাল পাওয়া যায় না। কিন্তু কৌটিল্য অন্যের মতবাদের সহিত নিজের মতবাদের বার বার তুলনা করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় এই সকল বিষয়ে তখন শাস্ত্র ছিল। দণ্ড-নীতি বলিলে সম্পূর্ণ রাষ্ট্র-নীতিই বুঝাইত। ইহার তত্ত্ব বা নীতি শিক্ষা দিতেন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ; আর বড় বড় রাজপুরুষদের নিকট ইহার ব্যাবহারিক শিক্ষা পাওয়া যাইত। রাজ্যের বড় বড় অধ্যক্ষেরা রাজপুত্রদের শিক্ষক হইতেন।

চূড়াকরণের পরই অক্ষর-পরিচয় (লিপি) এবং অঙ্ক (সংখ্যান) শিক্ষার আরম্ভ হইত। ৩ বৎসর হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে ইহার উপযুক্ত কাল ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা উপনয়নের পূর্বেই শেষ হইত। উপনয়নের বয়স ছিল ৫ হইতে ৮ পাত্রবিশেষে শিক্ষা অসমাপ্ত থাকিলে উপনয়ন ১০ হইতে ১২ বৎসরেও হইতে পারিত।

১৬ বৎসরের পর বিবাহ হইত। তাহারপর দৈনন্দিন কার্য-সূচি এইরূপ ছিল—সকালের দিকে যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষা এবং বিকালে ইতিহাস-শিক্ষা। ইতিহাস অর্থে বুঝাইত—পুরাণ (পুরুষ-পরম্পরা-গত শ্রুতি), ইতিবৃত্ত (অবদান আকারের ইতিহাস), ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র (নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি এবং আন্ত-র্জাতিক-নীতি) বার্তাজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বহু স্থানে পাওয়া যায়। কৌটিল্য পূর্বশাস্ত্রকারদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্র কার্যত বার্তার অন্তর্গত ছিল। অর্থনীতি সংক্রান্ত সমুদয় শাসন-বিভাগ ইহার অধীন ছিল। মাত্র উৎপাদন নয়, সুসঙ্গত বণ্টন, স্থানান্তরিত করিবার সুব্যবস্থা, কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্র, পালিত পশু-চিকিৎসা, মোটা শিল্প, কামারের কাজ, ছুতারের কাজ, দড়ি তৈার করার কাজ, উৎপন্ন দ্রব্যের সংরক্ষণ, কেবল দুর্ভিক্ষ সময়ের ব্যবহারের জন্য সঞ্চয়, বাটকারা, ওজন, মাপের ব্যবস্থা, মূল্য, বেতন বা

পরিশ্রম, মুদ্রানির্মাণ, টোল-শুল্ক, ছাড়পত্র ইত্যাদি সমস্তই ইতিহাসের মধ্যে ধরা হইত।

রাজপুত্রের ১৬ বৎসর বয়সের পর দূর দেশে প্রখ্যাত গুরুদেবের নিকট পাঠ লইতে যাইতেন। রাজপুত্রদের বিদেশে গিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিবার বহু উদাহরণ পালি জাতকে পাওয়া যায়। সাধারণ শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্যও বিদেশ যাত্রার পরিচয় আছে। এই রকম করিয়া তাঁহাদের ঔদ্ধত্য নষ্ট হইয়া সংযম-শিক্ষা হইত, শীতাতপ সহ্য করিবার শক্তি লাভ হইত এবং দেশবিদেশের রীতি-নীতির পরিচয় লাভ ঘটিত। শিক্ষান্তে তাঁহারা নগর, গ্রাম এবং দেশ ভ্রমণ করিতেন। রামায়ণে রাজপুত্রদের শিক্ষার উপযুক্ত বিষয় দেওয়া হইয়াছে—ধনুর্বেদ, নীতিশাস্ত্র, হস্তী ও রথতত্ত্ব, আলেখ্য ও লেখ্য, লঙ্ঘন (উল্লম্ফন ও অন্য ব্যায়ামাদি) এবং প্লবন (সন্তরণ)।

রাজা যে যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন না তাহার পরিচয় কৌটিল্যে আছে। পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে, রাজা সেই রূপ সমস্ত আর্তজনকে রক্ষা করিবেন। রাজা যে পারিষদ ভিন্ন চলিতে পারেন না, তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু রাজা বাস্তবিক কিরূপ হইবেন এবং সত্যই কেমন ছিলেন তাহার পরিচয় বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়। জাতকের গল্পে ও বিভিন্ন রাজাদের কথায় বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা রামচন্দ্রের ইতিহাস অস্বাভাবিক কাহিনীতে পূর্ণ নয়। অথর্ববেদে রাজকর্তা বা রাজনির্বাচনকারীদের উল্লেখ আছে। মহাভারতে উল্লেখ আছে পুরু, দেবাপি প্রভৃতি নির্বাচিত রাজা ছিলেন। গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রও যে বহু ছিল তাহারও উল্লেখ অথর্ববেদ (৫. ২০. ৯) ও বৌদ্ধ-গ্রন্থে আছে। দ্বৈরাজ্যের উদাহরণও বিরল নয়। অর্থশাস্ত্রেও (৮. ২. ১২৮) আছে। জৈন আয়ারাঙ্গ সুত্তেও আছে। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের একসঙ্গে শাসনের উল্লেখ আছে। মহাবস্তুতে রাজা মহেন্দ্রের তিনপুত্রের একসঙ্গে রাজত্ব করার কথা আছে।

চষ্টন ও রুদ্রদামা একত্র রাজত্ব করিতেন পণ্ডিতেরা এরূপ কথাও বলিয়াছেন। জৈন সাহিত্যে গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রের অতি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের বড় বড় লোককেই রাজা বলা হইয়াছে। বৈশালী-গণতন্ত্রে রাজপদবীর সংখ্যার অবধি ছিল না। ভদ্দিয় বুদ্ধের সম্পর্কে ভাই। তাঁহাকে কখন রাজাও বলা হইয়াছে। রাজা শুদ্ধোদনকে মাত্র শাক্য শুদ্ধোদন বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গণতন্ত্রের গৌরব বড় কম ছিল না। বহুকাল পরেও সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে লিচ্ছবী-দৌহিত্র বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ববোধ করিতেন। আমার মনে হয় অশোক অনুশাসনের সাতিয়পুত্ত, কেরলপুত্ত প্রভৃতি গণতন্ত্র-মূলক জাতিরই উল্লেখ। এরূপ হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে, উত্তরে ও দক্ষিণে গণতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যের চক্রবর্তী সম্রাট্ নিয়মতন্ত্রানুগ বলিয়া মনে হয়। ইহার মহত্ত্ব উদারতা ও অবিসংবাদী। এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেকালের রাজারা যথেচ্ছাচারী ছিলেন এরূপ ভ্রান্তধারণা না হয়। রাজপুত্রদের শিক্ষা-বিষয়ে এরূপ চেষ্টা করা হইত যাহাতে তাহারা উপযুক্ত রাজা হইতে পারে। রাজার সঙ্গে প্রজাদের হৃদয়ের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত ছিল, তাই এদেশের প্রজাদের বিদ্রোহের ইতিহাস নগণ্য অথবা নাই বলিলেই চলে। অযোগ্য রাজা যে রাজ্যচ্যুত হন নাই তাহা নহে, তবে তাহার স্থানে নূতন রাজাকেই বসান হইয়াছে। প্রজাতন্ত্রের আবশ্যক হয় নাই।

বুদ্ধের জীবনে বুদ্ধের শিক্ষার যে বর্ণনা আছে তাহাতেই সেই সময়কার রাজপুত্রদের শিক্ষার চিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার বিষয়গুলির নাম করিতেছি—লিপি, পুঁথি প্রস্তুতকরণ, আখ্যায়িকা কথন, ব্যাকরণ, অঙ্ক, কাব্য, নিঘণ্টু, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, নিরুক্ত শিক্ষা, ছন্দ, যজ্ঞাবাধ ও প্রকরণ। সাঙ্খ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র, ভৈষজ্য, শল্য, দেহতত্ত্ব, স্ত্রী-পুরুষ, অশ্ব ও অন্যান্য জীবগণের লক্ষণবিদ্যা, পশুপক্ষীর রবের অর্থ, অপরের চিন্তা

অনুমান, প্রহেলিকা সমাধান, স্বপ্নতত্ত্ব, সংগীত, নৃত্য, নাট্যবিদ্যা, আবৃত্তি, ঐকতান, লাক্ষাকর্ম, সূচিশিল্প, মোমকর্ম, বৃক্ষপত্রের শিল্পকর্ম রঞ্জনশিল্প, বিভূষণ কর্ম, মূক অভিনয়, মুখোস পরিয়া অভিনয়, ইত্যাদি। গৌতমকে মল্লযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধ, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, ধনুর্বিদ্যা ইত্যাদি শিখিতে হইয়াছে।

বৈদিকযুগের শিল্প

আর্যজাতি অতি সুপ্রাচীনকালেই সভ্যতা সোপানে আরূঢ় হইয়া শিল্পবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এক্ষণে, ভারতে শিল্পোন্নতি বিষয়ে যথেষ্টই চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বৈদিক আর্যগণ অপেক্ষা আধুনিক ভারতবাসিগণ যে শিল্প বিষয়ে অধিক উন্নতি করিয়াছেন, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। আজকাল, কতকগুলি কলকারখানা লইয়াই আমাদের শিল্পবিদ্যার উৎকর্ষ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। বস্তুতঃ কলকারখানা ব্যতীত আমাদের শিল্পোন্নতির উপায়ান্তর নাই। এ বিষয়ক উন্নতি চেষ্টাও আবার বৈদেশিক প্রকারে। যাহা হউক যৎকালে জগতের তাবৎ জাতি অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হইয়া বন্য পশুর ন্যায় অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিতেছিল, যৎকালে বর্ণমালার সৃষ্টি বিষয়ে অন্য কোন জাতি কল্পনাও করে নাই, তৎকালে আর্যজাতি যে কত শিল্পোন্নতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। প্রাচীন আর্যজাতির শিল্পকীর্তিকলাপের চিহ্নমাত্রও অধুনা দৃষ্টিগোচরের সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু তাঁহাদের যাবতীয় কীর্তিনিচয়ের জ্বলন্ত ইতিহাস—আমাদের প্রাচীনতম অবলম্বন 'বেদ' অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং সুপ্রাচীন আর্য শিল্পালোচনার পক্ষে বৈদিক যুগের শিল্পানুশীলনই সর্বপ্রথমে কর্তব্য।

বৈদিককালে আর্যগণ কর্তৃক মৃৎকুটীর বড় একটা ব্যবহৃত হইত না। সাধারণত তাঁহারা ইষ্টক বা প্রস্তর নির্মিত বৃহৎ প্রাসাদ রচনা করিয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের গৃহগুলি ছাদযুক্ত এবং গবাক্ষ ও দ্বারবিশিষ্ট হইত (১.১১৩.৪)। গৃহ ইষ্টক নির্মিত হইত এবং সবিশেষ প্রচলিত ছিল। গৃহ নির্মাণের জন্য চুন, সুরকি প্রভৃতি ব্যবহৃত

হইত (৪.৪৭.২)। বেদে "ইষ্টকাস্তম্ভ" অট্টালিকা ইত্যাদি বহুশব্দ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকার অস্তিত্ব বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। ঋগ্বেদে "সহস্রদ্বার বিশিষ্ট গৃহ" (৭.৪৪.৫), "সহস্রস্তম্ভরক্ষিত প্রাসাদ" (২.৪১.৫), "বিস্তৃত বাসস্থান" (১.৩৬.৪), "প্রস্তরগৃহ", "বক্রপ্রস্তর" ইত্যাদির বহুল প্রয়োগ বিদ্যমান। তৎকালে গৃহ নানারূপে ও নানা উপাদানে নির্মিত হইত। গৃহ রচনা পদ্ধতি যে তৎকালে বিশেষ উন্নত ছিল তাহার একটি কারণ আমরা দেখিতেছি। তৎকালে আর্যগণ এরূপভাবে গৃহ রচনা করিতেন যে, রচনাদোষে বায়ু-পিত্ত-কফ কোন ধাতুই যেন বক্র বা দূষিত হইয়া গৃহবাসিগণকে ব্যাধিগ্রস্ত না করে (৬.৪৯.৯)। গৃহগুলি একতল হইতে ত্রিতল পর্যন্ত নির্মিত হইত। অধিকন্তু, অধিক স্তম্ভযুক্ত থাকায় উহা যে অতি সৌন্দর্যময় ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই (২.১.৫.৬২.২)। বশিষ্ঠঋষি ত্রিতল বাসভূমির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই বাক্যে ত্রিতল গৃহের বিদ্যমানতার বিষয়ে সাক্ষী।

আর্যগণ পরিচ্ছদ বিষয়েও যথোচিত উৎকর্ষ সাধন করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ ও আজকালকার পরিচ্ছদে বড় বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। তৎকালীন বস্ত্রবয়ন-পটুতার বিষয় ঋগ্বেদে বহুবার কথিত হইয়াছে (২.৩৮.৪ ; ২.৩.৬ ; ৬.৯.১ ; ৪.৪০.৬ ; ৩.৩.৬ ; ১০.১০৭.৯০ ; ৫.২৯.১৫)। যজুঃ ও সামবেদে বস্ত্রের অনেক উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭.১৮)। স্বর্ণখচিত কার্পেটের উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিককালে বস্ত্রবয়নের চারিটি মাত্র উপাদান ছিল। পশম, চর্ম, কার্পাস, মেষলোম (৩.৫.৪)। সূত্রগুলি কখন কখন বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করাও হইত। প্রত্যুতঃ শ্বেত বস্ত্রই তৎকালে বিশেষ আদৃত হইত (৩.৩৯.২)। সচরাচর তন্তুনির্মিত বস্ত্র, পিরান অথবা তনুত্রাণ (আঙ্গা) ও উষ্ণীষ ব্যবহৃত হইত (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.২.১৮ ; অথর্ববেদ ১৫.২.১)। স্ত্রীলোকগণ টানা ও পড়েন দ্বারা বস্ত্রবয়ন করিতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন (৬.৯.২)। তাঁহারা সর্ব

শরীরে সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিতেন এবং পরিধেয়ের উপর কঞ্চুক ব্যবহার করিতেন ও সর্ব প্রকার উষ্ণীষ ধারণ করিতেন। বিবাহ কালে মেষলোমের বস্ত্র ব্যবহৃত এবং যৌতুকস্থলে উহা উপহার প্রদত্ত হইত। আর্যগণ চর্মের অতি পরিষ্কার কার্য জ্ঞাত ছিলেন। ভিস্তিরা চর্ম দ্বারা পথ জলসিক্ত করিত। আর্য স্বয়ং বহুবিধ জুতা ব্যবহার করিতেন (আর্যসভ্যতা গ্রন্থোদ্ধৃত—Buhler's Apastamba, p. 14)। এই সমস্ত জুতা চর্মে প্রস্তুত হইত। ঋগ্বেদে নাপিত ও ক্ষৌরকার্যের বিষয় উল্লেখিত আছে (১.১৬৪.৪৪ ; ১.৯২.৪ ; ১০.১৪২.৪)। সুতরাং স্থির হইতেছে যে, ক্ষৌরকার্যোপযোগী দ্রব্যেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। অলঙ্কার ধারণ প্রথা আমাদের দেশে বোধ করি চিরকালই প্রচলিত আছে। সুদূর প্রাচীন বৈদিকযুগেও আমরা বহুবিধ সুন্দর অলঙ্কারের ব্যবহার-বাহুল্য দেখিতে পাই। বৈদিক যুগেও স্বর্ণালঙ্কার (১.৩৪.৪) বলয়, (৪.৫৩.৪), অঙ্গুরীয় ও বিচিত্র কণ্ঠমালা (১.৩৩.১০) সুবর্ণ কুন্তল, মেখলা, মল (২.১২২.১৪) ইত্যাদি অলঙ্কার বিশেষ প্রচলিত ছিল। মুক্তাদি খচিত স্বর্ণ অলঙ্কারের যে খুব প্রচলন ছিল, তাহা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩.৬৬৫) ও যজুর্বেদের নানা স্থানে উক্ত আছে। "মালা" ব্যতীত বক্ষে "রুক্ম" নামে এক প্রকার অলঙ্কারও উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিক কালে শঙ্খ প্রবলাদি নানা কারুকার্যে ব্যবহৃত হইত। ইহাও উক্ত আছে যে, স্ত্রীলোকেরাও নানারূপ নৈপুণ্যে তাঁহাদের কেশবন্ধন করিতেন (৪.৮৬), কিন্তু সে নিপুণতা কিরূপ, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমোদ-প্রমোদের জন্য শালগুঞ্জিক (৩.৩২.২৩) ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও তৎকালে প্রচলিত ছিল। বৈদিক আর্যগণ শিশু বা খদির কাষ্ঠ নির্মিত রথ ও গাড়ী ব্যবহার করিতেন (৪.৬৩.৫ ; ৩.৫৩.১৯)। অশ্ব ও গর্দভ এই গাড়ী ও রথ বহন করিত। চক্রগুলি পিতল নির্মিত, রথস্তম্ভাদি লৌহময়। বোধ হয়, ঐ সময়ে দু'একখানি স্বর্ণ-মণ্ডিত রথেরও প্রচলন ছিল। এই রথগুলির বসিবার স্থান সকলও

সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। রথের সম্মুখে কাষ্ঠনির্মিত অশ্বাদির সন্নদ্ধ থাকিত। সাধারণত চর্মতন্তু, চর্মরশ্মি (লাগাম) ব্যবহৃত হইত। ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক রথচালনা বা গঠনবিদ্যা বর্তমান-কাল অপেক্ষা হীন ছিল না। ঋগ্বেদে "ত্রিস্তম্ভবিশিষ্ট ত্রিকোণ যান" (১.৪৭.২), "তিনটি বসিবার স্থানযুক্ত যান" (২.২৮৩.১) ইত্যাদি প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয়। মনোহরদৃশ্য জলযান (জাহাজ) ও নৌকা ব্যবহার বিষয় বেদে অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। বৈদিক আর্যগণ শুধু যে শিল্পী ছিলেন তাহা নয়, তাঁহারা বীরও ছিলেন, তাঁহারা যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য বর্ম, হস্তঘ্ন, চর্ম, (ঢাল) প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। শত্রুকে আক্রমণ করিবার সময় তাঁহারা বর্শা, পরশু, বাশী (বাইশ), ধনুর্বাণ ও লৌহাগ্র কাষ্ঠময় বিষাক্ত বাণ ব্যবহার করিতেন। রণবাদ্য মধ্যে দুন্দুভি, ক্ষৌণী, কর্করী ও ঢক্কা তাঁহাদের ব্যবহারে আসিত। এই বস্তুগুলি যেমন তাঁহারা নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিতেন, তেমনই তাঁহারা দক্ষতার সহিত নির্মাণ করিতেন। এ সমস্ত নির্মাণ বিষয়ে তাঁহারা আধুনিকদিগের অপেক্ষা কোন অংশে অবনত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

বৈদিক শিল্প বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। আর্যদিগের পরিচ্ছদ, যুদ্ধাস্ত্র, অলঙ্কার ও গৃহাদি নির্মাণ বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইল, তাহা হইতে তাঁহাদের তৎকালীন শিল্প বিষয়ের যৎসামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। তাঁহারা যে শিল্পোন্নতি বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের এই আভাষ দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে। যাহা হউক, বৈদিকযুগের শিল্পালোচনা করিতে গিয়া আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, মৃন্ময় এবং স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্রময় দ্রব্য তৎকালে নির্মিত হইত। সূত্রধর, কর্মকার, তন্তুবায়গণ যথাক্রমে কাষ্ঠ কার্য, অলঙ্কার গঠন এবং বহুমূল্য সূক্ষ্ম বস্ত্রবয়নে বিলক্ষণ পটু ছিল। তৎকালে গজদন্তের কারুকার্যেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে

যে, তাঁহারা বোধ হয় কাচ ও রেশম ব্যবহার করিতে জানিতেন না। সে যাহা হউক, সুদূর প্রাচীন বৈদিক শিল্পনিচয় আলোচনা করিলে সকলকেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে, শুধু দু'একটি শিল্প বিষয়ে কেন, সমগ্র শিল্প বিষয়ই আর্যগণ এককালে সর্বজাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধযুগে শিল্প-শিক্ষা

ভারতে শিক্ষা-প্রচারে বৌদ্ধদের হাত খুব বেশী। বৌদ্ধযুগে দেখিতে পাওয়া যায় হীনযান বৌদ্ধধর্মের সহিত গৃহস্থদের তত বেশী সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু কিছু পরেই অশোকের সময়েই দেখা যায় বৌদ্ধধর্মকে গৃহস্থের ধর্ম করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রচণ্ড চেষ্টা চলিতেছে। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম মগধের একটা স্থানীয় ধর্ম-সম্প্রদায় ছিল, মহাযান কিন্তু সকলকেই আশ্রয় দিয়াছিল। সেখানে ভিক্ষুক গৃহস্থের পার্থক্য ছিল না, সর্ব মনুষ্যই বোধিসত্ত্ব। মুক্তির দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্র ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া বলিতে পারা যায় যে, প্রথম হইতেই বৌদ্ধ বিহার শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এক-একটি বৌদ্ধ বিহারই ছিল এদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। বুদ্ধের সময় হইতে দীর্ঘকাল পর পর্যন্ত জেতবনবিহার বৌদ্ধ-দর্শনের কেন্দ্র ছিল। ফা-হিয়েনও তাঁহার সময়ে জেতবনের এই গৌরবের উল্লেখ করিয়াছেন। পাটলীপুত্রের কুক্কুটারাম বিহার অশোকের সময় এবং তাহার পরেও খুব বিখ্যাত ছিল। এই সকল বিহার বড় বড় ভিক্ষু, পণ্ডিত ও বহু শিষ্যের সঙ্ঘ ছিল। সকল রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এখানে হইত। এই চর্চায় জাতিভেদের কোন বাধা ছিল না। অবশ্য ব্যবহারিক শিল্পের এখানে স্থান ছিল না; আয়ুর্বেদ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত, ইহা সেখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই রকম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ঐতিহাসিক চিহ্ন বোধ হয় পাওয়া যায় সারনাথের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। এক নম্বর বিহারটিকে বিহার বলিয়া মনে হয় না; বিহারগুলি চতুঃশালা হইত। এটি ঠিক তেমন নয়। ভিক্ষুদের অবস্থান স্থানও নিতান্ত অপ্রচুর;

ইহার সম্মুখে বড় বড় চত্বর ছিল; বড় বড় দরজা ছিল। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়রূপেই ব্যবহার হইত বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করিবার সময় প্রথমেই নালন্দার নাম করিতে হয়। সমগ্র বৌদ্ধ জগতে নালন্দার তুলনা ছিল না। সে সময় এ রকম বিদ্যালয় আর কোথাও ছিল না। যুয়ন-চয়ঙ বলেন শক্রাদিত্য এখানে বিহার নির্মাণ করেন। অতঃপর বুধগুপ্ত ও পরে তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য এবং বালাদিত্য পুত্র প্রভৃতি বহু রাজা এখানে বিহারাদির নির্মাণ করেন। নালন্দার বিরাট্ প্রাসাদগুলির বর্ণনায় চৈনিক পরিব্রাজকরা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখিয়াছিলেন সপ্ততল প্রাসাদের চূড়া মেঘ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। প্রাসাদের কারুকার্য দেখিয়াও বিস্মিত হইতে হয়।

দূর দেশ-বিদেশ হইতে সকল ধর্মের ছাত্ররা এখানে আসিত।

বিভিন্ন শিল্পের পরিচয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যথেষ্ট পাওয়া যায়—সে সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিব। বর্তমান প্রবন্ধে বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যে নানাবিধ শিল্প, শিল্পিগণ ও শ্রেণী পরিচয় পাওয়া যায়; ইহাদের অবলম্বন করিয়াই কলাশিক্ষার ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষত বাৎস্যায়ন কামসূত্রে সমুদয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাম দেওয়া হইয়াছে—'চতুঃষষ্টি যোগ।' রামায়ণে শিল্পাদির উদাহরণ আছে—যেমন, 'গীতবাদিত্রকুশলা নৃত্যেষু কুশলাস্তথা। উপায়জ্ঞাঃ কলাজ্ঞাশ্চ বৈদিকে পরিনিষ্ঠিতাঃ॥" বাজসনেয়ি-সংহিতা, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ, হরিবংশ, ভবিষ্যপুরাণ এবং কথাসরিৎসাগরে শিল্প বুঝিতে প্রধানত সূক্ষ্ম কর্ম বা চারুশিল্পই বুঝায়। শিল্পের আবার দুই প্রকার ভাগও দেখা যায়—চৌষট্টি বাহ্য কলা ও চৌষট্টি অভ্যন্তর কলা। বাহ্যকলার উদাহরণ, ভাস্কর্য, নৃত্য, গীতাদি, ছুতোরের কাজ, কামারের কাজ ইত্যাদি। আভ্যন্তর কলার

উদাহরণ,—চুম্বন, আলিঙ্গনাদি। এই কলার শ্রেণী বিভাগ শাঙ্খ্যায়ন-ব্রাহ্মণে, মহাভারত ও মনুতে আছে। মহাভারতের সাধারণ অর্থেও শিল্পকলার প্রয়োগ আছে। শৈবতন্ত্রে চতুঃষষ্টি কলার প্রত্যেকটির নাম পাওয়া যায়। কামসূত্রে যে চতুঃষষ্টিযোগ আছে তাহা ও চতুঃষষ্টিকলা একই। বাৎস্যায়ন ঐ যোগ নারীদের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন; যে সকল নারী রাজগৃহে স্থান পাইবে অথবা শ্রেষ্ঠা গণিকা ইত্যাদি হইবে। ললিতবিস্তরে বুদ্ধদেব ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে নারী লিপিতে, কাব্য-রচনায়, সূত্র প্রভৃতিতে শিক্ষিতা হইবেন তাহাকেই তিনি গ্রহণ করিবেন। জৈন কল্পসূত্রে মহিলাদের জন্য চৌষটি গুণ-চর্চার বিবরণ আছে। শ্রীধর স্বামী ভাগবত পুরাণের ভাষ্যে বলিয়াছেন, যাদব রাজকুমাররা চৌষট্টি কলায় শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ঐ সকল কলা নারী বা পুরুষ কাহারও জন্য বিশেষ করিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই; গুণ হিসাবে সকলেই উহাদের আহরণ করিতে পারিত। যে কোন জ্ঞান দ্বারা কাহারও মনোরঞ্জন করিতে পারা যায় তাহাই শিল্পকলা—এইরূপ কথাই শুক্রনীতিতে বলা হইয়াছে। বিভিন্ন কলা-সমষ্টির নাম 'বেদ', এরূপও কয়েকটি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। 'গন্ধর্ববেদে' নৃত্য, গীত, শয্যাশিল্প ইত্যাদি সপ্তকলা আলোচিত হইত।

খারবেল গান্ধর্ব-বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তেরও এই বিদ্যায় বেশ দাবি ছিল। আয়ুর্বেদে দশকলার সন্ধান পাওয়া যায়; রন্ধন, উদ্যানতত্ত্ব, পুষ্পসারবিদ্যা প্রভৃতি এইরূপ দশকলা। ধনুর্বেদে যুদ্ধের অস্ত্র, বাহন, ব্যূহ-রচনা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া পঞ্চকলার ব্যবস্থা আছে।

আমাদের প্রাচীন ভারতে অনেক বিদ্যাপীঠের নাম পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিদ্যাপীঠে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন প্রভৃতি আলোচিত হইত। সেগুলি কিন্তু শিল্পকলা-শিক্ষার স্থান ছিল না। সাংসারিক বিদ্যা বা শিল্প গণতন্ত্রীদের সভাতে আলোচিত হইত—কৌটিল্য এরূপই

নির্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ-সাহিত্যের জাতকগুলিতেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায় যে, বহু লোক শিল্প-শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় যাইত। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে লেখা আছে যে, ব্যবহার-শাস্ত্রের জন্য তক্ষশিলা বিখ্যাত ছিল। মহাভারতের আদিপর্বে আছে, তক্ষশিলার লোকেরা বিদ্যায় অদ্বিতীয়। রাজপুত্রেরাও শিল্প-শিক্ষার জন্য সুদূর তক্ষশিলায় গমন করিত। ভীমসেন-জাতকে পাওয়া যায় যে, ধনুর্বিদ্যা শিখিতে লোকে তক্ষশিলায় গমন করিত। তক্ষশিলা আয়ুর্বেদের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহা খ্রী-পূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে যে উত্তর ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ছিল তাহা নিঃসন্দেহ; মাত্র শিল্প-শিক্ষার কেন্দ্র নয় সর্বশাস্ত্রের শিক্ষাপীঠ বলিয়াই ইহার প্রসিদ্ধি ছিল। খ্রী-পূর্ব চতুর্থ শতকে গান্ধার-মধ্যবর্তী তক্ষশিলা ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষার ও অন্যান্য শিক্ষার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ইহা বর্তমানে রাওলপিণ্ডি হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে। ব্রাহ্মণ ও বড় বড় লোকের ছেলেরা শিক্ষার জন্য এখানে আসিত। তক্ষশিলার ছাত্ররাও বারাণসী ও পাটলীপুত্রে পড়িতে যাইত। তক্ষশিলার তীক্ষ্ণধী ছাত্রেরা কখন কখন বারাণসীতে গিয়া শিক্ষকতাও করিত। যখন শিক্ষকেরা ছাত্র পড়াইতেন বা কাহারও সঙ্গে কোন বিশেষ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন, তখন তাঁহাদের হাতে বেশ সুন্দরভাবে বাঁধান বই থাকিত। যষ্ঠ, উপবর্ষ ও পাণিনি প্রথমে তক্ষশিলার ছাত্র ছিলেন। পরে তাঁহারা তক্ষশিলা ত্যাগ করিয়া পাটলীপুত্রে গমন করেন। রাজশেখরের 'কাব্য-মীমাংসা'য় একথা লেখা আছে।

শিল্পশিক্ষার একটা বিশেষ ধারা এই ছিল যে ইহার শিক্ষা পুরুষানুক্রমে চলিত। বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিপুত্র হইয়া ব্যবসায় করিতেন, চিকিৎসকের পুত্র হইয়া ব্যবসায় করিতেন—ইহাতে যে বিদ্যার একটা উৎকর্ষ নিতান্ত সম্ভব তাহা না বলিলেও চলে। বিদ্যায় যে গতানুগতিক ভাবও আসিতে পারে তাহাও অসম্ভব নয়। কামারের

ছেলে শিশুকাল হইতেই কামারের কাজ দেখিতে দেখিতে একটা সহজ শিক্ষা লাভ করে; সে শিক্ষা নবাগতের পাইতে অনেক সময় কাটিয়া যাইত। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জাতিগত শিক্ষা অপেক্ষা ভাল উপায় পাওয়া যাইত না। প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্ট পথ আছে; তাহার অন্নের ব্যবস্থা জন্ম হইতেই হইয়া আছে। তবে জাত-ব্যবসায় বদল করাও কিছু কঠিন ছিল না। উচ্চবর্ণের লোকদেরও ব্যবসায় হিসাবে সাধারণ শিল্পকর্ম শিক্ষা করিতে দেখা যায়। জাতকে আছে, একজন ক্ষত্রিয় প্রথমে কুম্ভকারের কাজ করে, ঝুড়ি তৈয়ারীর কাজ করে, মালাকারের কাজ করে, শেষে সে পাচকেরও কাজ করিয়াছিল। তাহাতে কোন দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জাতকে এমনও পাওয়া যায় যে কোন ব্রাহ্মণ একজন তীরন্দাজের সহকারী হইয়াছে; সেই তীরন্দাজ আবার পূর্বে বয়ন করিত। একটি আখ্যায়িকায় পাওয়া যায় যে, এক ব্রাহ্মণ শিকার করিয়া অন্ন সংস্থান করিত। আর একটি আখ্যানে আছে, ব্রাহ্মণেরা রাখালের কাজ করিতেছে, আরও দেখা যায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত আহার করিতেছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ত্যক্ত স্ত্রীকে গ্রহণ করিতেছে।

দেখিতে পাই, বিশেষজ্ঞের নিকটও শিক্ষা লওয়া হইত। জীবক কুমারভৃত্য সাত বৎসর শিক্ষানবীস থাকিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা করেন। জীবকের বিবরণে পাওয়া যায় যে, কোন শিল্প-বিদ্যা জানা না থাকিলে জীবন ধারণ করা কঠিন হইত। তবে রাজার গৃহেও লোককে শিল্পের কাজ শিখিতে হইত।

কারিগরের কারখানাই শিল্প-বিদ্যালয় ছিল। কারিগর যদি উত্তম শিল্পীকে রাজসমীপে আনিতে পারিত তাহা হইলে সে বিশেষ পুরস্কার পাইত।

শহরের এক একটা অংশে বিশেষ শ্রেণীর শিল্পী বা কারিগরেরা থাকিত। বিশেষ বিশেষ শহর বিশেষ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল।

দূর দেশ হইতে লোকে সেখানে সেই শিল্প শিখিতে আসিত। বারাণসীর হস্তিদন্ত-কর্মের বোধ হয় বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। হস্তি-দন্ত-শিল্পীরা নগরের একটা বিশেষ অংশে থাকিত। রঞ্জনকারীরা, গন্ধ-বণিকেরা শহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বাস করিত। শ্রাবস্তীর তন্তুবায়দের একটা বিশেষ স্থান ছিল। কখনও কখনও শিল্পীরা শহরের প্রান্তে বাস করিত। জাতকে এই সকলের ভূয়োভূয়ঃ দৃষ্টান্ত আছে। কুম্ভকার, ছুতোর, কামার ও নাবিকেরা নগরের প্রান্তদেশে বিভিন্ন অংশে বাস করিত। কৌটিল্য এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। স্ট্রাবো বলেন, জাহাজ-নির্মাণ এবং বর্ম-নির্মাণ মাত্র রাজার জন্য হইত ; বাহিরের লোকের এ সকল শিক্ষা করার সম্ভাবনা ছিল না। কথাটি ঠিক বিশ্বাস করিতে পারি না। শ্রেষ্ঠীরা দেশ-দেশান্তরে ব্যবসায় করিত। ছয় মাসের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিত ; তাহাদের জন্য জাহাজ নির্মাণ না হইলে চলিত কি করিয়া? ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধের পরিচয় প্রচুর পাওয়া যায় ; তাহাদের বর্ণই বা মিলিত কোথা হইতে? করণ তৈয়ারীর এক চেটিয়া অধিকার ছিল রাষ্ট্রের। শিল্পীদের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, রাজাকে তাহা দেখিতে হইত। যদি কেহ তাহাদের ব্যবসার কোন প্রকার হানির চেষ্টা করিত, তাহাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হইত।

বিনয়ের উপালির গল্পে, উপালিকে শিল্পবিদ্যা শিখাইবার কথা হইতেছিল। রূপ, লেখ, গণনা এই সকল শিখাইবার কথা হয়। রাজপুত্রদের শিক্ষা উপলক্ষ্যে বলিয়াছি রূপ শব্দের অর্থ মুদ্রাতত্ত্ব ; ইহা ভাস্কর্য, চিত্রণ বা অভিনয়ও বুঝাইতে পারে। শিল্প শিক্ষার্থীদের বাস হইত গুরুগৃহে ; শিক্ষা হইত কারখানায়। কারখানা কিন্তু খুব বড় ছিল না ; শিক্ষানবীসদের সংখ্যাও খুব বেশী হইত না। সে যুগে সহস্র সহস্র ছাত্র-সমন্বিত আচার্য বা কুলপতিদের কথা শোনা যায় না ; তবে একজন গুরুর অধীনে ছাত্রের সংখ্যা নিতান্ত কমও ছিল না। কখনও কখনও গুরুও একাকী তাহাদের দেখিয়া উঠিতে

পারিতেন না। পুরাতন ছাত্রেরা 'পিট্‌ঠি আকরিয়' বা ছোট ছোট শিক্ষক হইয়া নবাগতদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিত। অন্তত এইরূপ ব্যবস্থার কথা ভিক্ষুদের বিষয়ে শোনা যায়। মনে হয় শিল্পশিক্ষারও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল।

তক্ষশিলার পরেই বারাণসীর খ্যাতি। আধ্যাত্মিক বিদ্যাচর্চার স্থান বলিয়া বারাণসী বিশেষ করিয়া বিখ্যাত। জাতকের যুগে কাশী প্রবল প্রতাপশালী রাজ্য ছিল। বুদ্ধের জন্মের সময় হইতেই কাশীর নাম পড়িয়া যায়।

বোধ হয় উজ্জয়িনীর খ্যাতি ছিল বিদ্যাপীঠ বলিয়াই। জ্যোতিষ-চর্চার ইহা কেন্দ্র ছিল। উজ্জয়িনীর উল্লেখ বিশেষ করিয়া পাওয়া যায় জৈনসূত্রে।

অর্থশাস্ত্রের অধ্যায়ের পর অধ্যায় চলিয়াছে শ্রেণী, গণ ও সঙ্ঘের ব্যবস্থা লইয়া। শ্রেণীগুলি যে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। তাহাদের আভ্যন্তরিক বিধি-ব্যবস্থা তাহারা নিজেরাই করিত। উহাদের শিক্ষানবীসী করিতে হইলে বা ছাত্র হইতে হইলে উহার অনুমোদন ভিন্ন সম্ভব হইত না। ছাত্রদের বিষয়ে নানারূপ নিয়মও ছিল।

কত প্রকারের গণ বা শ্রেণী ছিল ঠিক বোঝা যায় না; তবে বৌদ্ধ-সাহিত্যে উহাদের সংখ্যা সকল সময়েই অষ্টাদশ বলা হইয়াছে; কিন্তু অষ্টাদশের অধিক সংখ্যক ব্যবসার সন্ধান উহাতেই পাওয়া যায়।

সংগ্রহ করিলে নানাস্থান হইতে বহুপ্রকার শিল্পের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। রপ্তানীতে তুলার বস্ত্র, রেশমের কাপড়, কম্বল, লোমের সুন্দর পোষাক ইত্যাদি যাইত। এগুলি রং করিবার জন্যও শিল্পী ছিল। শ্রেষ্ঠীরা সুদক্ষ নাবিক ভিন্ন চলিত না। জাহাজের কাজে কাষ্ঠশিল্পীদের পরিচয় পাওয়া যায়। জিনিসপত্র বহন করিতে গাড়ী, যানকার, রথকার প্রভৃতির কথা বহুবার পাওয়া যায়।

চিত্রণ-বিছ্যার কথাও গ্রন্থে বার বার মিলে। চিত্র-শিল্পীরও অভাব ছিল না। বিনয়ে fresco-চিত্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। হস্তি-দন্তের কারুকার্য ও শিল্পের কথায় বৌদ্ধশাস্ত্রে পরিপূর্ণ।

মেগাস্থেনিস, মগধের রাজপ্রাসাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ফা-হিয়েন প্রায় সহস্র বৎসর পরেও যে সকল প্রাসাদ দেখেন, তিনি বলেন, তাহাদের তুলনা কাহারও সহিত হইতে পারে না। এ সমস্তই ছিল কাষ্ঠ-শিল্পীর কাজ। ভাস্করের কাজের কথাও শোনা যায়। স্তম্ভ-নির্মাণ, চৈত্যের অপূর্ব কারুকার্যময় রেলিং প্রভৃতি রচনা এবং সাধারণ গৃহ-নির্মাণেও শিল্পীদের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহগুলি সাধারণত কাষ্ঠেরই হইত। সৈন্য ও ক্ষত্রিয়দের জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হইত এবং অন্য বহু কার্যে কামারের দরকার হইত।

অলঙ্কার শিল্পের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের বিশেষ পরিচয় bas reliefএ মেলে। সাহিত্যেও নারী ও পুরুষের অলঙ্কার-প্রিয়তার পরিচয় আছে। চর্ম-শিল্পের উল্লেখও বহু স্থানে আছে। পাদুকা-ব্যবহার খুবই সাধারণ ছিল। ধনীরা সুবর্ণ-পাদুকা ব্যবহার করিত। পাচক, মোদক, রজক, নাপিত এবং অঙ্গসেবাকারীরও সংখ্যা বড় কম ছিল না। ঝুড়ি বোনা এবং মাদুর বোনাও অনেকের কার্য ছিল। পুঞ্জ-শিল্প অনেকেরই অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিত। একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক মাহুত ছিল। লেখক বা কেরানীর কাজও বেশ কদরের কাজ ছিল। হিসাব লেখকদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধগ্রন্থ পড়িয়া মনে হয় গণিকাকেও শিল্পী বলিয়া সে যুগে লোকে স্বীকার করিত। এইরূপ সর্ববিধ শিল্পীরা অষ্টাদশ গণে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গণের বিশেষ প্রতিপত্তিও ছিল। প্রত্যেক দলপতির রাজসভাতে বিশেষ স্থান ছিল। শ্রেণীদের এমন সুনাম ছিল যে, তাহারা নিজে মুদ্রা চালাইতে পারিত; তাহাদের হুণ্ডি বা নোট সর্বত্র গ্রাহ্য হইত। শ্রেণীর ইতিহাস ও

অবস্থা-ব্যবস্থার কথা বলিবার অনেক আছে। কিন্তু এখানে সেগুলি আলোচ্য নয়। আমি শুধু বলিতে চাই এইরূপ শ্রেণী বা গণ বা সঙ্ঘ থাকায় ব্যবহারিক শিল্প-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়া যাইত।

এই সমস্ত যুগে বর্তমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যালয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। কৌটিল্যের কথায় মনে হইতে পারে রাজকীয় সাহায্যে ছোট ছোট বিদ্যালয় চলিত। সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের সহিত বর্তমান শিল্প-শিক্ষায়তনের বা সাধারণ বিদ্যালয়ের তুলনা চলে না। আমরা যেমন মিথিলার খ্যাতি, নবদ্বীপের খ্যাতি শুনিয়া আসিতেছি, ঐরূপ ঐ সময়েও বিশেষ বিশেষ স্থানের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তখন সেখানে ঐ সকল বিশেষ বিষয়ে বড় বড় গুরু থাকিত; কিন্তু গুরুরা প্রত্যেকে পৃথক্। সকল গুরুর এবং সকল ছাত্রের কোন সমবায় বা সঙ্ঘ হয় নাই। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা এক গুরুর নিকটে হওয়া সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার আবশ্যক হইত।

প্রাচীনযুগের অলঙ্কার

সমাজের সকল অবস্থাতেই অলঙ্কারের প্রতি ঝোঁক, সাজসজ্জার প্রতি ঝোঁক মানুষের রহিয়াছে। যখন মানুষ মৃৎপাত্রের ব্যবহার জানিত না, যখন তাহাদের মধ্যে কৃষির প্রচলন হয় নাই, যখন মানুষে জন্তুদিগকে গৃহে পালন করিতে শেখে নাই, সেই আদি প্রত্নযুগেও মানুষের মনে শরীরকে অলঙ্কৃত, ভূষিত ও মণ্ডিত করিবার প্রবৃত্তির উন্মেষ হইয়াছিল। ফুজিয়ার জাতি, আণ্ডামান দ্বীপের প্রাচীন জাতি প্রভৃতি যে সকল আদিম জাতি আজিও বাঁচিয়া থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে শরীর-মণ্ডনের আদিম প্রথার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যায়। আদি প্রত্নযুগের মানুষ শরীরের শ্রী ও শোভা সম্পাদনের জন্য স্থায়ীভাবে অঙ্গবিশেষের বিকৃতি সাধন করিত। উল্কি-চিত্রণে অঙ্গ বিভূষিত করিত, অঙ্গে রঙ ফলাইত এবং রত্নাভরণ প্রভৃতি দিয়া দেহ মণ্ডিত করিত। রত্নাভরণের মধ্যে কণ্ঠে পরিহিত হারের ব্যবহারই আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। এই হার নানা আকারে, নানা উপকরণে নির্মিত হইত। কণ্ঠাভরণ, নাসালঙ্কার, অধরভূষণ, হস্তাভরণ, চরণ-মণ্ডন ও কটি-মেখলা নানা জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ, কাল ও জাতিভেদে রুচির বিভিন্নতা অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় অলঙ্কারবিষয়েও সুস্পষ্ট। আদিমযুগে প্রকৃতিজাত সৌন্দর্য-উপকরণে অঙ্গাভরণের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। পাখীর পালকে শরীর অলঙ্কৃত করিবার প্রথা এখনও রহিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপের অধিবাসীরা কাকের পালকে দেহ শোভিত করে। তাহারা কড়ির হারও পরে। ইউরোপের সুসভ্য ইংরেজ অথবা ফরাসী জাতি উটপক্ষী ও ময়ূর প্রভৃতির

চাকচিক্যময় পালকের সজ্জা এখনও ভালবাসে। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসিগণ তাহাদের পূর্বপুরুষদের চিহ্নস্বরূপ জন্তু ও বৃক্ষাদি, দেবক প্রভৃতি নিজেদের শরীরে প্রচ্ছান করিয়া থাকে। এক সময়ে মানুষ প্রজাপতির ডানা, নানাপ্রকারের বীজ, অত্যুজ্জ্বল প্রস্তর, বিচিত্র পত্র প্রভৃতি অঙ্গে ধারণ করিয়া তাহার অঙ্গশোভা বর্ধন করিয়াছে। তারপর জ্ঞান ও সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধাতুর অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। কেমন করিয়া এই সমস্ত প্রসাধনের ব্যাপার ঘটিল তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

সকল দেশের চাইতে ভারতে গহনার আদর বেশী। প্রাচীনতম না হইলেও অপেক্ষাকৃত পুরাতন আর্যগণ অলঙ্কারের খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের বড় বড় বীর যোদ্ধারা অলঙ্কার পরিতেন। আমাদের স্থাপত্যে গহনাপরা এরূপ যোদ্ধমূর্তি যথেষ্ট আছে। আর সেগুলি সবই এক ধরণের—উৎসবের বেশে সজ্জিত—তদুপযোগী আভরণে অলঙ্কৃত। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এই সমস্ত মূর্তি যেন একই ছাঁচে ঢালা—পরিবর্তন কাহাকে বলে তাহারা যেন জানেও না, বোঝেও না। আশ্চর্য, ভারতের আশপাশের দেশেও এই একই অপরিবর্তনীয় লীলার অভিনয় হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন আর্যদের এবং আর্য-ঔপনিবেশিকদের উৎসবোপযোগী অলঙ্কারের আকৃতি ও প্রকৃতি ভারতের গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে। অবশ্য দেশ-বিদেশের বিশেষ বিশেষ রুচি ও পদ্ধতির অনুবর্তী হইয়া একই অলঙ্কার বহু আকারে পর্যবসিত হইয়াছে। বর্মা ও সায়ামে, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায়, বালি ও যবদ্বীপে রাজাদের উৎসব-বেশে, বরকন্যার সাজসজ্জায় সেই পুরাতন ভারতীয় উৎসবের অলঙ্কার কথঞ্চিৎ সংস্কৃত আকারে আজও দেখিতে পাওয়া যায়। নাট্যশালা-গুলিতেও যেখানে প্রাচীন চরিত্রের অভিনয় করিতে হয়, সেখানে প্রাচীন অলঙ্কারগুলিও বাদ যায় না। আরও আশ্চর্যের কথা ভারতের অনার্য-অধ্যুষিত প্রদেশে, অথবা প্রাচীন সুসভ্য প্রদেশবাসী জাতি-

সকলের নিম্নস্তরের মধ্যে প্রাচীন অলঙ্কারের নিদর্শন যত বেশী পাওয়া যায়, ভারতের সুসভ্য রাজ্যগুলিতে তাহার একাংশেরও কল্পনা করা যায় না। সুসভ্য দেশে লোকে বেশভূষায় কালপ্রভাবেরই বশবর্তী হইয়া থাকে।

প্রাচীন অলঙ্কারের মধ্যে শিল্পরুচি ও শিল্পচাতুরী সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি অসাধারণ কারুকার্যখচিত—শিল্পীর প্রশংসনীয় শিল্পবুদ্ধি অলঙ্কারের ভিতর দিয়া সর্বপ্রকারে আত্মরক্ষা করিয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধদের ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্পকৌশল কোন দিন আসীরীয়দের অলঙ্কৃতির অভ্যাসসিদ্ধ একঘেয়ে একটানা পদ্ধতির মধ্যে আত্মাবমাননা বিঘোষিত করে নাই।

আমাদের দেশে প্রাচীনতম যুগের অলঙ্কার পরিকল্পনা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। চারিখানি বেদের কোনও বেদে 'অলঙ্কার' বলিয়া কোনও শব্দ পাওয়া যায় না। বেদে কিন্তু 'অরংকৃত' 'অরংকৃতি' শব্দ পাওয়া যায়—অর্থ অলঙ্কার। বৈদিক 'অরম্' শব্দ হইতে 'অলম্' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঋ হইতে অর নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয়ার একবচনে অরম্ [অব্যয় (adv. acc.)] 'অরম্' হইতে 'অলম্' = ঠিক, যথেষ্ট (fit, fitly, justly)। অলঙ্কার শব্দ বেদে নাই বলিয়া তখন নরনারীর অঙ্গশোভারূপ অলঙ্কার অথবা কাব্য-শোভারূপ অলঙ্কার ছিল না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ভূষণ, আভরণ প্রভৃতি অলঙ্কার-পর্যায়ের কোন শব্দই বেদে নাই। বেদে অনেক অলঙ্কার বা গহনার নাম পাওয়া যায়। অলঙ্কারবাচক শব্দও বেদে নাই তাহাও নহে। ঋক্ সংহিতায় দেখা যায় মরুদ্‌গণ অলঙ্কারের বিশেষ প্রিয় ছিল (১. ৬৪ ; ৮. ২০ ; ১০.৭৮)। তাহারা সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার পরিয়া শরীরের শোভাবর্ধন করিত। রুদ্রকে ঋগ্বেদে উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিত ও কণ্ঠহারশোভিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মরুদ্‌গণ ও অশ্বিদ্বয়েরও

অনুরূপ বর্ণনা আছে। দেব প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরদেরও স্বর্ণ ও মণি-মুক্তাখচিত অলঙ্কার ছিল। ঋষি কক্ষিবান্ স্বর্ণকুণ্ডল ও রত্নহার-শোভিত পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারাদির কথা আছে। বৈদিক অলঙ্কার বুঝাইতে একটি সাধারণ শব্দের প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। সে শব্দটি 'অঞ্জ' বা 'অঞ্জি'। একটা উদাহরণ দেওয়া গেল—

চিত্রৈরঞ্জিতভির্বপুষে ব্যঞ্জতে বক্ষঃসু রুক্মাঁ অধি যেতিরে শুভে।
অংসেষ্বেষাং নি মিমৃক্ষু ঋ্ষ্টয়ঃ সাকং জজ্ঞিরে স্বধয়া দিবো নরঃ॥

—ঋ° ১. ৬৪. ৪.

—"শোভার জন্য মরুদ্গণ নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা স্বশরীর অলঙ্কৃত করেন। শোভার নিমিত্ত বক্ষে সুন্দর হার ধারণ করেন; অংসদেশে আয়ুর্ব ধারণ করেন, নেতা মরুদ্গণ অন্তরীক্ষ হইতে স্বকীয় বলের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।"

ম্যাকডোনেল ও কীথ তাঁহাদের 'বৈদিক সূচী'তে মাত্র একুশটি অলঙ্কারের নাম দিয়াছেন। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়—

(ঋগ্বেদ)

১ আনূক, ২ ওপশ, ৩ কর্ণশোভন, ৪ কুরীর, ৫ কৃশন, ৬ কৃশনিনূ, ৭ খাদি, ৮ নিষ্ক, ৯ ন্যোচনী, ১০ পুণ্ডরীক, ১১ পুষ্কর, ১২ প্রভূষণ, ১৩ বর্হন, ১৪ ভূষণ, ১৫ মণি, ১৬ রত্ন, ১৭ রুক্ম, ১৮ রুক্মি, ১৯ ললামী, ২০ বরিমৎ, ২১ ব্যঞ্জন, ২২ বিষণ, ২৩ শতপত্র, ২৪ সিবন, ২৫ সূনিষ্ক, ২৬ স্তুকা, ২৭ হিরণ্ময়ী, ২৮ হিরণ্যশিপ্র, ২৯ হিরীমৎ।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় আরও কয়েকটি নূতন নাম—

৩০ পুণ্ডরিস্রজ, ৩১ প্রাকাশ, ৩২ ভোগ, ৩৩ স্রজ্।

অথর্ববেদে আরও কয়েকটি নূতন নাম—

৩৪ কুম্ব, ৩৫ জীবভোজন (অঞ্জন), ৩৬ দেবাঞ্জন, ৩৭ নলদ,

৩৮ নিষ্কগ্রীব, ৩৯ নীনাহ (=কোমরপাট্টা), ৪০ প্রসাধন, ৪১ মধুলক, ৪২ রুক্মস্তরণ, ৪৩ ললাম, ৪৪ ললামগু, ৪৫ ললাম্য, ৪৬ সীমন্, ৪৭ সুরুক্ম, ৪৮ সুস্র, ৪৯ স্বন্দাজ্ঞি, ৫০ হরিতস্রজ্, ৫১ হিরণ্যজ, ৫২ হিরণ্যস্রক্, ৫৩ হৈরন্য।

এইগুলির কোন-কোনটির অর্থ সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন ; যেমন গেল্ডনার (Geldner) বলেন, "আনূক" শব্দের অর্থ 'ভূষণ' ; কিন্তু রোট (Roth), লুড্ভিগ (Ludwig) ও ওলডেনবার্গ (Oldenburg) বলেন, ইহা ক্রিয়ার বিশেষণ। ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ 'ভূষণ' অর্থই স্বীকার করিয়াছেন। আমাদেরও তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

উপরিলিখিত শব্দগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে বৈদিকযুগে স্বর্ণালঙ্কার ও মণি-মুক্তার অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। তখন 'ওপশ' ছিল—কেশালঙ্কার। মাথার ভূষণ ছিল 'কুম্ব'। কর্ণশোভন তো ছিলই। সে যুগে রমণীরা মাথায় আরও একটা গহনা পরিত—তাহার নাম ছিল 'করীর'। তাহারা পায়ে পরিত 'খাদি' গলায় পরিত 'নিষ্ক'। এ ছাড়া 'প্রবর্ত' নামে একরকম গোলাকৃতি অলঙ্কার ছিল। তখনকার মেয়েরা মাথার সম্মুখের দিকে ঝালর-দেওয়া রত্নখচিত সিঁথি পরিত। এই সিঁথির মাঝখানে চন্দ্রাকৃতি খচিত থাকিত। খোঁপার সঙ্গে ইহারই একাংশ লাগাইয়া দেওয়া হইত। এই সিঁথি চার রকমের, তাহাদের নাম—ললাম, ললামী, ললাম্য ও ললামগু। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে সুবর্ণনির্মিত স্রকের কথা আছে। বৈদিক-কালে সোনার অর্ধচন্দ্রাকৃতি একরকম হার ছিল তাহার নাম 'রুক্ম'। ইহা বক্ষের শোভা সম্পাদন করিত। তারপর 'ফন' 'প্রাকাশ', 'মণি', 'মনা', 'শঙ্খ', 'স্তূক'—আরও কত রকমের ভূষণ ছিল।

অলঙ্কার শব্দ চারি বেদে নাই বটে, কিন্তু উল্লেখের অভাব

অনস্তিত্বের কারণ হয় নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে অলঙ্কার শব্দের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায়—

"অঞ্জনাভ্যঞ্জনে প্রযচ্ছত্যেষ হ্যমানুষোঽলঙ্কারঃ"

—১৩. ৮. ৪. ৭ ; ৩. ৫. ১.৩৬

তারপর উপনিষদ্-যুগে অলঙ্কার শব্দের প্রচার হয়। মৃত্যুর পর পরজীবনে বস্ত্রালঙ্কার ব্যবহারের জন্য শবের সহিত বস্ত্র ও অলঙ্কার দেওয়া হইত। অথর্ববেদে (১৮. ৪. ৩১) তাহার নিদর্শন আছে। উপনিষদেও তাহার নজির পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮. ৮. ৪) গহনা (ornament) অর্থে অলঙ্কার শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়—"প্রেতস্য শরীরং বসনেনালঙ্কারেণ সংস্কুর্বন্তি" ৮.৮.৫। এখানে প্রেতের শরীরকে বসন দিয়া অলঙ্কার দিয়া সংস্কার করা হইতেছে। ছান্দোগ্যে গহনারও নাম আছে—রাজা জানশ্রুতি রৈক্ক ঋষিকে ছয় শত গরু, একটি নিষ্ক ও অশ্বতরী-যুক্ত রথ দান করিয়াছিলেন। এ নিষ্ক ছিল হার। "রৈক্কেমানি ষট্শতানি গবাময়মশ্বতরীরথো নুমত্রতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতা মুপাস্ম ইতি। তমুহপরঃ প্রত্যুবাচাহহারে ত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্ব"—৪র্থ অধ্যায়। বৈদিক যুগে 'সৃঙ্কা' নামে অত্যুজ্জ্বল হারের নাম কঠবল্লীতে (১. ১৬) পাওয়া যায়। যম নচিকেতাকে একটি সৃঙ্কা দিয়াছিলেন। "তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমা মনেকরূপাং গৃহান" (১.১৬)।

গহনার নাম অলঙ্কার হইল কেন? প্রাচীনকালের ঋষিদের মধ্যে একজন ইহা লইয়াও মাথা ঘামাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, নারীকে যতকিছু দাও না কেন, তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। তাহাকে ভাল কাপড়, ভাল খাবার, ভাল জিনিষ, যাহাই দাও, সে 'না' বলিবে না—যেমনি তাহাকে গহনা দিবে অমনি সে খুশী হইয়া বলিবে 'আর না' অলম্' 'বেশ হইয়াছে'। এই অলং-করা হয় বলিয়া গহনার নাম হইয়াছে 'অলংকার'। অলঙ্কারের এটি একটি প্রাচীন সুরসিক শাব্দিকের সরস তাৎপর্য।

ভারতের নাট্যশাস্ত্রের পূর্বে অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা কোথাও দেখা যায় না। পরবর্তী কোষগ্রন্থে অলঙ্কারের নামও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের ২১শ অধ্যায়ে ভরত অলঙ্কার লইয়া অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিনি অলঙ্কারকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অলঙ্কার আবেধ্য, বন্ধনীয়, ক্ষেপ্য ও আরোপ্য। কুণ্ডলাদি আবেধ্য; শ্রোণী সূত্র, অঙ্গদাদি বন্ধনীয়; নূপুর, বস্ত্রাভরণ ক্ষেপ্য; স্বর্ণসূত্র ও নানাপ্রকার হার আরোপ্য।

চতুর্বিধন্তু বিজ্ঞেয়ং দেহস্যাভরণং বুধৈঃ।
আবেধ্যং বন্ধনীয়ঞ্চ ক্ষেপ্যমারোপ্যকন্তথা॥
আবেধ্যং কুণ্ডলাদীহ যৎস্যাচ্ছ্রবর্ণভূষণম্।
শ্রোণীসূত্রাঙ্গদৈর্মুক্তা বন্ধনীয়া বিনির্দিশেৎ॥
প্রক্ষেপ্যং নূপুরং বিদ্যাদ্বস্ত্রাভরণমেব চ।
আরোপ্যং হেমসূত্রাণি হারাশ্চ বিবিধাশ্রয়াঃ॥

নাট্যশাস্ত্র—২১. ১১-১৩

তারপর তিনি বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, চূড়ামণি আর মুকুট হইল শিরোভূষণ। কর্ণের অলঙ্কার—কুণ্ডল। মুক্তাবলী অর্থাৎ মুক্তাহার হর্ষক এবং সূত্র কণ্ঠভূষণ। অঙ্গুলির আভরণ হইল বটিকা ও অঙ্গুলিমুদ্রা। কেয়ূর ও অঙ্গদ—কূর্পরের ভূষণ। ত্রিসর ও হার গ্রীবা ও স্তনমণ্ডলের ভূষণ; তরল ও সূত্রক এই দুইটি কটিভূষণ ছিল। তখন দেহভূষণ বলিলে বুঝাইত মুক্তাহার ও মালা। এগুলি সাধারণত বেশ বিলম্বিত হইত। এই সমস্ত অলঙ্কার পুরুষরা পরিত।

চূড়ামণিঃ সমুকুটঃ শিরসো ভূষণং স্মৃতম্।
কুণ্ডলং কর্ণমেবৈকং কলাকরণমিষ্যতে॥
মুক্তাবলী হর্ষকঞ্চ সসূত্রং কণ্ঠভূষণম্।
বটিকাঙ্গুলিমুদ্রা চ স্যাদঙ্গুলিবিভূষণম্॥

ত্রিসরশ্চৈব হারশ্চ গ্রীবাবক্ষোজভূষণম্ ।
তরলং সূত্রকশ্চৈব ভবেৎ কটিবিভূষণম্ ॥
অয়ং পুরুষনির্যোগঃ কার্য্যস্ত্বাভরণাশ্রয়ঃ ।
ব্যালম্বিমুক্তিকা হারা মালাত্মা দেহভূষণম্ ॥

—২১. ১৫-১৯

তারপর দেবতাদের ও মর্ত্যবাসিনী রমণীদের অলঙ্কারের কথা ভরত মুনি বর্ণনা করিয়াছেন। সেই অলঙ্কারগুলির নাম ভরত নাট্য-শাস্ত্রে (২১.১৯-২১) এইরূপ—

শিখাপাশ। কুণ্ডল। শিখাজাল। খড়্গাপত্র। খণ্ডপত্র। বেণী-গুচ্ছ। চূড়ামণি। দারক। মকরিকা। ললাটতিলক। মুক্তাজাল। গুচ্ছ (ভ্রূ এবং কক্ষের উপরিভাগে ধারণ করা হইত)। গবাক্ষি। কুসুম (নানারকম ফুলের অনুকরণে স্বর্ণাভরণ)।

এছাড়া, কানের গহনার নাম (২১.২২-২৪)—কর্ণিকা, কর্ণবলয়, পত্রকর্ণিকা, আপেশ্রুক, কর্ণমুদ্রা, কর্ণোৎপল, নীলারত্নখচিত দন্তপত্র। গণ্ডস্থলের গহনার নাম—তিলক ও পত্রলেখা। যাস্কের নিরুক্তে এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে শুধু অলঙ্কারের উল্লেখ আছে তাহা নহে, বিভিন্ন প্রকার নানা অলঙ্কারের নাম ও বর্ণনা আছে। একটা উদাহরণ দিতেছি—পাণিনি ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। এক জায়গায় (৪. ৩. ৬৬) দুইটি ভূষণের নাম করিয়াছেন। কর্ণে থাকে বলিয়া একটি গহনার নাম 'কর্ণিকা', ললাটে থাকে বলিয়া আর একটি অলঙ্কারের নাম 'ললাটিকা'। তাঁহার সূত্র হইল—"কর্ণললাটাৎকনলঙ্কারে"। ইহার বৃত্তি এই—"কর্ণললাটশব্দাভ্যাং কন্ প্রত্যয়ো ভবতি তত্র ভব ইত্যেতস্মিন্ বিষয়েঽলঙ্কারেঽভিধেয়ে।" 'যৎ' প্রত্যয় (৪. ৩. ৫৫) না হইয়া সেইখানে আছে এই অর্থে কন্ প্রত্যয় হইবে।

রামায়ণে (সুন্দর ২. ৬) লিখিত আছে, লঙ্কাপুরযোষিদ্‌গণের কর্ণে বজ্র অর্থাৎ হীরকখচিত বৈদূর্য মণিখচিত কুণ্ডল ছিল।

মহাভারতেও (বন—প° ৫৭) মণিকুণ্ডলের উল্লেখ আছে। ভাগবতেও (১০.২৯. ৪) গোপাঙ্গনাদের কৃষ্ণাভিসার বর্ণনায় তাহাদের বলা হইয়াছে—আজগ্‌মুরন্যোন্যমলক্ষিতোত্থমাঃ সবত্র কান্তো জবলোল-কুণ্ডলা। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের একটি স্ত্রীমূর্তির কর্ণে 'তালপত্র' নামক কর্ণাভরণের নিদর্শন আছে। অমরকোষের বর্ণনার সহিত ইহার মিল আছে। ভুবনেশ্বরের (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Indo-Aryans) ৬৪ সংখ্যক চিত্রের কর্ণাভরণ বাঙলাদেশের ঝুমকার অনুরূপ। ৬৫ সংখ্যক মূর্তি মণিকর্ণিকা। ৬৬নং চিত্র পুরীর কাষ্ঠ শিল্প হইতে গৃহীত। এই মূর্তির অনুরূপ কর্ণাভরণ বাঙলাদেশের 'ঢেড়ী' নামে পরিচিত। ৬৩, ৬৪, ৬৫নং চিত্রের কর্ণাভরণগুলি সুবর্ণনির্মিত ও তাহাতে মণি-মুক্তা সূক্ষ্মভাবে খচিত ছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীনকালে বহুপ্রকার অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। বহুবিধ কণ্ঠহারের মধ্যে শীর্ষক, উপশীর্ষক, প্রকাণ্ডক, অবঘাটক ও তরলপ্রতিবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মুক্তাহারের উল্লেখ বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়। সমান আকৃতির মুক্তামালায় হার রচনা করিয়া কেন্দ্রস্থলে একটি বড় মুক্তা দিয়া 'শীর্ষক' প্রস্তুত হইত। এইরূপ হারের কেন্দ্রস্থলে পাঁচটি বড় বড় মুক্তা থাকিলে তাহাকে উপশীর্ষক বলা হইত। 'প্রকাণ্ডকে' ক্রমহ্রাসমান মুক্তামালায় রচিত হারের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় মুক্তা থাকে। অবঘাটক সমান অবয়বের মুক্তামালায় রচিত হইত। মুক্তাহারের কেন্দ্রস্থলে একটি উজ্জ্বল মুক্তা দিয়া যে হার রচিত হইত তাহার নাম—তরলপ্রতিবন্ধ। এক হাজার আট লহরে 'ইন্দ্রচ্ছন্দ', ইহার অর্ধেক লহরে 'বিজয়চ্ছন্দ' এবং চৌষট্টি লহরে 'অর্ধহার' নামক মুক্তাহার রচিত হইত। এতদ্ভিন্ন চুয়ান্ন গাছি মুক্তামালার লহরে 'রশ্মিকলাপ', বত্রিশলহরে 'গুচ্ছ', সাতাশ লহরে 'নক্ষত্রমাল' চব্বিশ লহরে 'অর্ধগুচ্ছ', বিশ লহরে 'মানবক' এবং দশ লহরে 'অর্ধমানবক' হার রচিত হইত। উপরোক্ত হারগুলির ঠিক মধ্য-

ভাগে একটি বড় মুক্তা বসাইয়া দিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হইত; এইরূপ হার 'বিজয়চ্ছন্দ-মানবক' 'অর্ধহার-মানবক' ও 'বল্লিকলাপ-মানবক' প্রভৃতি আখ্যা পাইত।

অনেকগাছি মুক্তামালার লহরের হারগুলি আবার শীর্ষক, উপশীর্ষক, প্রকাণ্ডক, অবঘাটক এবং তরলপ্রতিবন্ধ প্রভৃতির আদর্শেও প্রস্তুত হইত। উপরোক্ত আদর্শে রচিত হারগুলিকে 'শুদ্ধহার' বলিত; এইরূপ 'ইন্দ্রচ্ছন্দ-শীর্ষক' 'ইন্দ্রচ্ছন্দ-উপশীর্ষক' প্রভৃতি হার ছিল।

মুক্তামালায় রচিত অন্যপ্রকার হারের নাম ফলকহার; এই সকল হারের মধ্যভাগে তিনটি, পাঁচটি করিয়া চ্যাপ্টা মুক্তা বসান থাকিত; এইরূপ তিনটি চ্যাপ্টা মুক্তাখচিত হারকে 'ত্রিফলক' এবং পাঁচটি মুক্তাখচিত হারকে 'পঞ্চফলক' বলিত। একগাছি লহরে রচিত মুক্তাহারকে 'একাবলি' এবং 'একাবলি'র মধ্যভাগে একটি 'মণি' বসান থাকিলে তাহাকে 'যষ্টি' বলিত। এইরূপ হারের মধ্যে মধ্যে স্বর্ণমালা থাকিলে তাহাকে 'রত্নাবলী' বলিত।

পর পর একগাছি করিয়া মুক্তাহার এবং সমান অবয়বের স্বর্ণহারে রচিত হারকে 'অপবর্তক' হার বলা হইত। দুই গাছি মুক্তাহারের মধ্যে একগাছি স্বর্ণলহর দিয়া 'সোপানক' প্রস্তুত হইত; এইরূপ হারের মধ্যভাগে একটি 'মণি' খচিত থাকিলে তাহাকে 'মণি-সোপানক' বলা হইত। স্বর্ণখচিত অপবর্তক, সোপানক, মণি-সোপানক, যষ্টি, একাবলি প্রভৃতি প্রাচীনকালে শিরোহার, কঙ্কণ, বলয় ও ঘুন্টিকা প্রভৃতি মুক্তাখচিত অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়।

অর্থশাস্ত্রে স্বর্ণকারদের কথাও আছে। সদর রাস্তার কেন্দ্রস্থলে স্বর্ণকারদের দোকান থাকিত; উচ্চবংশের সচ্চরিত্র নিপুণ কারিগর ভিন্ন অন্য কেহ দোকান খুলিতে পারিত না। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার বিভাগ বা ব্যবসায় যাহাতে সততার সহিত চালিত হয়, সেইজন্য

রাষ্ট্রের একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকিতেন; তাঁহার অধীনে 'অক্ষশালা' থাকিত। এই অক্ষশালায় স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুর কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হইত এবং স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইত। স্বর্ণকারগণ স্বর্ণের গুণ নির্ণয়ে এবং ধাতুদ্রব্যাদি সম্বন্ধে রসায়ন-বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অক্ষশালায় চারিখানি কক্ষ এবং মাত্র একটি দ্বার থাকিত; অক্ষশালায় স্বর্ণকারগণ এবং যাহাদের সেখানে কাজ রহিয়াছে তাহারা ভিন্ন কেহই প্রবেশ করিতে পারিত না; ইহার নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোর ছিল। স্বর্ণকারগণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের কাঞ্চন, পৃষিত (শূন্যগর্ভ), তষ্ট্রী বা মণিখচিত স্বর্ণ এবং তপনীয় প্রভৃতি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতে নিযুক্ত থাকিত। অক্ষশালায় যে স্থানে বসিয়া স্বর্ণকারগণ কার্য করে, তাহাদের কোন কার্য যে-পর্যন্ত সমাপ্ত না হয়, সেই পর্যন্ত সেই স্থানে অসমাপ্ত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি থাকিত। তাহারা কার্যের জন্য যে স্বর্ণ গ্রহণ করিত, দৈনিক কার্য সমাপন করিয়া তাহার হিসাব তাহাদের বুঝাইয়া দিতে হইত। যে সকল অলঙ্কার সমাপ্ত হইত তাহা কারিগর ও তত্ত্বাবধায়কের শীলমোহরে বন্ধ করিয়া রাখা হইত।

ক্ষেপণ, গুণ এবং ক্ষুদ্র—এই তিনপ্রকার অলঙ্কারের কাজ ছিল। কাচের দানায় স্বর্ণখোচিত-করণের কাজকে ক্ষেপণ বলা হয়। স্বর্ণের লহরকে গুণ বলিত। এতদ্ভিন্ন নিরেট অথবা শূন্যগর্ভ বিবিধ মালা তৈয়ারী হইত, তাহাকে 'ক্ষুদ্র' বলা হইত।

স্বর্ণকারকে স্বর্ণ দিলে সেই পরিমাণ রাজমুদ্রাও প্রস্তুত করিয়া দিতেন; সাধারণ লোকও এইরূপ স্বর্ণ বিনিময়ে স্বর্ণকারদের নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণ করিতে পারিতেন। স্বর্ণকারগণ এইজন্য রাষ্ট্রের অধীনে বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইতেন।

শূদ্রদের মৃচ্ছকটিকে একজন মণিকারের বিপণি বর্ণনায় আমরা মুক্তা, হীরক, মণিমাণিক্য, পদ্মরাগমণি, প্রবাল, গোমেধ, বৈদূর্যমণি প্রভৃতির এবং স্বর্ণে খচিত বিবিধ মণি-মুক্তার কারুকার্যের উল্লেখ

পাই। বিভিন্ন অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যবিচারে ইহার উপাদান, দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি ও সংস্কৃতির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হয়; শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে শিল্পের উপাদান বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট; যে দ্রব্য বা পদার্থ হইতে যে অলঙ্কার প্রস্তুত হয়, তাহার সঙ্গে সেই অলঙ্কারের মৌলিক যোগ রহিয়াছে। কর্দম অথবা পাথরে যে কারুকার্য করা হয়, তাহার সঙ্গে নিশ্চয়ই স্নতার কারুকার্যের পার্থক্য রহিয়াছে। প্রত্যেক কারুকার্যেই একটি ছন্দ ও একটি স্নুর রক্ষিত হয়; তাহা দেখিলেই শিল্পীর রুচি ও সংস্কৃতির আভাস পাওয়া যায়।

কাব্যেও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। পুরুষরাও নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করিত। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। মেঘদূতের যক্ষ "কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ"—প্রকোষ্ঠ হইতে তাহার কনকবলয় ভ্রষ্ট হইয়াছে। আবার ভাল কাজ করিলে তাহার পুরস্কারের জন্য এগুলি দানও করা হইত। চারুদত্ত কর্ণপূরককে পুরস্কার দিতে উদ্যত হইলেন। পূর্বে তাঁহার ধন ছিল, তখন গহনা পরিতেন। এখন অদৃষ্টের পরিহাসে তিনি নিঃস্ব,—কিন্তু তাঁহার মনে নাই—তাঁহার অঙ্গে ভূষণ নাই; পূর্ব অভ্যাসবশতঃ শীঘ্র অলঙ্কার খুলিয়া দিতে গেলেন। কিন্তু অঙ্গের যেখানে যেখানে অলঙ্কার ধারণ করা হয়, সেই সেই স্থানে হাত দিয়া দেখিলেন—আভরণ নাই। তখন নিরুপায় হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ উত্তরীয় নিক্ষেপ করিলেন। মুদ্রা-রাক্ষসে দেখা যায়, রাক্ষস অলঙ্কার পরিয়া মলয়কেতুর নিকট যাইতেছেন। পর্বতকও এই অলঙ্কারগুলি পরিতেন। রাক্ষস নিবেদন করিতেছেন—"উচ্যতাং শকটদাসঃ। যথা পরিধাপিতা কুমারেণাভরণানি বয়ম্। তন্নযুক্তমনলঙ্কৃতৈঃ কুমারদর্শনমনুভবিতুম্। অতো যত্তদলঙ্করণত্রয় ক্রীতং তন্মধ্যাদেকং দীয়তাম্।"—শকটদাসকে বল, কুমার আমার অলঙ্কার পরিয়াছেন; অলঙ্কার না পরিয়া কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করা অনুচিত। সুতরাং যে তিনটি অলঙ্কার

কেনা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি যেন পাঠাইয়া দেন। "রসাকর" একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মল্লিনাথ মেঘদূতের টীকায় এই গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মল্লিনাথকৃত একটি বচন এই—

কচধার্যং দেহধার্যং পরিধেয়ং বিলেপনম্।
চতুর্ধা ভূষণং প্রাহুঃ স্ত্রীণামন্যচ্চ দেশিকম্॥

—উত্তরমেঘ, ১৩ শ্লোকের টীকা।

এই গ্রন্থের মতে রমণীদিগের অলঙ্কার চতুর্বিধ (১) 'কচধার্য', অর্থাৎ যাহা মস্তকে ধারণ করা হয়, (২) 'দেহধার্য',—অঙ্গশোভা অলঙ্কার, (৩) 'পরিধেয়'—বস্ত্রাদি, (৪) 'বিলেপন'—চন্দন, কস্তুরী প্রভৃতি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশেষ অলঙ্কার 'দেশিক' নামে অভিহিত।

সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় তখন নূপুর, বলয়, কাঞ্চী, হার ও কুণ্ডলের খুবই প্রচলন ছিল।

রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'তে পাই—

"মরগ অমঞ্জীয়জুঅং চরণে সে লম্ভিসা বঅস্সাহিং।
ভীএ নিঅম্বফলএ ণিবেসি আ পঞ্চরাঅ মণিকঞ্চী।
দিন্না বশআ বলিও করকমল পট্টণাল জুঅলম্মি।"

—বয়স্যরা চরণে নূপুর পরাইয়া দিল। নিতম্বফলকে পদ্মরাগ-মণির কাঞ্চী নিবেসিত হইল। করকমলে বলয়, কণ্ঠে মুক্তাহার দেওয়া হইল, আর কর্ণে কুণ্ডলযুগল স্থাপিত হইল।

কর্পূরমঞ্জরীর অন্যস্থানেও পাওয়া যায়—সুন্দরীর হিন্দোল-লীলার আন্দোলনের সহিত তাহার মণিনূপুর রণিত হইতেছে, হার ঝন্ঝন্ করিয়া বাজিতেছে, মেখলার কিঙ্কিণী ক্বণিত হইতেছে, চঞ্চল বলয়ের মধুর নিনাদ শ্রুত হইতেছে।

তখনকার দিনে সুচতুর স্বর্ণকারদের দক্ষতাও লক্ষণীয়। মৃচ্ছ-কটিকের চতুর্থ অঙ্কে ইহার বেশ আভাস পাওয়া যায়। শিল্পিগণ বৈদুর্য, মৌক্তিক, প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল, কর্কেতরক, পদ্মরাগ,

মরকত প্রভৃতির রত্ন বাছাই করিতেছে। স্বর্ণ দিয়া মাণিক্য বসাইতেছে। সোনার গহনা তৈরি করিতেছে। লাল রঙের সূত্র দিয়া মুক্তাভরণগুলি গাঁথিতেছে। বৈদূর্যমণি ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিতেছে। শঙ্খ কর্তন করিতেছে—শানে প্রবাল ঘর্ষণ করিতেছে।

প্রাচীনকালে কণ্ঠাভরণ দুই রকমের ছিল। যাহা কণ্ঠে সংলগ্ন থাকিত তাহার সাধারণ নাম ছিল 'গ্রৈবেয়ক'। হৃদয়দেশে কথঞ্চিৎ বিলম্বিত হইলে তাহার নাম হইত 'ললন্তিকা'। ললন্তিকা সোনার হইলে তাহাকে 'প্রালম্বিকা' বলিত—আর মুক্তার হইলে 'উরঃ-সূত্রিকা' নামে অভিহিত হইত।

সুশ্রুত (সূত্রস্থান ১৬ অধ্যায়) বলিয়াছেন—

'রক্ষা-ভূষণনিমিত্তং বালস্য কর্ণৌ বিধ্যতে।

বাণ তাঁহার হর্ষচরিত 'ত্রিকণ্টক' নামক কর্ণাভরণের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"কদম্বমুকুলস্থূলমুক্তাফলযুগলমধ্যাধ্যাসিত মরকতস্য ত্রিকণ্টক-কর্ণাভরণস্য প্রেঙ্খত্তঃ প্রভয়া"

শিশুপালবধে কৃষ্ণের কুণ্ডলে গারুত্মত-মণির কথায় পাই—

"তস্যোল্লসৎ কাঞ্চনকুণ্ডলাগ্র-প্রত্যুপ্তগারুত্মতরত্নভাসা"—২.৩৩।

তারপর শিল্পশাস্ত্রে ও কোষগ্রন্থে অলঙ্কারের বেশ একটি পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। নিঘণ্টু ও যাস্কের নিরুক্ত ও পাণিনির পরে অমরাদির কোষগ্রন্থে অলঙ্কারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মিশ্রকল্প—পত্র, রত্ন ও অন্যান্যের সংমিশ্রণে তৈরি। এইগুলি দেবতা ও রাজাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি।

সাধারণ অলঙ্কারের নাম—

পাদনূপুর, কিরীট, মল্লিকা, কুণ্ডল, বলয়, মেখলা, হার, কঙ্কণ, শিরোভূষণ, কর্ণভূষণ, কেয়ূর, কর্ণ, চূড়ামণি, বালপট্ট, নক্ষত্রমালা, (২৭টি মুক্তা দেওয়া), অর্ধহার (৬৪ লহরযুক্ত), সুবর্ণসূত্র (হৃদয়শোভা), রত্নমালিকা, চির (চারফেরা নেকলেস), সুবর্ণকঞ্চুক,

হিরণ্যমালিকা (সোনার চেন), লম্বহার, পাদজাল, মকরভূষণ, মিশ্রিত ও রত্নকল্প (রাজা ও দেবতা ব্যবহার্য), রত্নপুষ্প, রুদ্রবন্ধ, লম্বপত্র, বলয়।

ময়মত প্রভৃতি শিল্পশাস্ত্রে অলঙ্কারের যথেষ্ট পরিচয় আছে। মানসারেও অনেক কথা আছে। মানসার বলে—শরীরের সাধারণ অলঙ্কারের নাম 'অঙ্গভূষণ'—গৃহের আসবাব 'বহির্ভূষণ'। মানসার-মতে অলঙ্কার চতুর্বিধ—পত্রকল্প, চিত্রকল্প, রত্নকল্প ও মিশ্রিত বা মিশ্রকল্প। এগুলি দেবতার উপযোগী। তবে চক্রবর্তী রাজা পত্রকল্প ব্যতীত আর তিনটি ব্যবহার করিতে পারেন। অধিরাজ ও নরেন্দ্র নামক রাজা রত্নকল্প ও মিশ্রিত পরিতে পারেন। অন্যান্য রাজাদের ভূষণ মিশ্রকল্প। লতা ও পত্র হইতে তৈরি বলিয়া নাম হইয়াছে 'পত্রকল্প'। পুষ্প, পত্র, অঙ্কন, বহুমূল্য প্রস্তর ও অন্যান্য অলঙ্কারের নাম চিত্রকল্প। রত্নকল্প—পুষ্প ও রত্ন (jewellery) দিয়া তৈরি।

মনুতে স্বর্ণশিল্প একটি বিশিষ্ট জাতির ব্যবসা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; স্বর্ণকারগণ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতেন; মনু স্বর্ণ-ব্যবসায় কৃত্রিমতার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। অমরসিংহের অভিধানে মুকুট, কিরীট প্রভৃতি বিবিধ শিরোভূষণ, অঙ্গুরীয়ক, বিবিধ কর্ণ-কুণ্ডল, কর্ণপুষ্প, শতনরী প্রভৃতি বিভিন্ন হার, অনন্ত, বলয়, কঙ্কণ, মেখলা, বেষ্টনী, হস্ত ও পদের বিভিন্ন প্রকার কঙ্কণ, নূপুর ও বলয় প্রভৃতির উল্লেখ ও বর্ণনা রহিয়াছে।

প্রাচীনযুগের অলঙ্কারাদির অধিকাংশই বর্তমানকালে প্রচলন না থাকিলেও ভুবনেশ্বর-মন্দির সাঁচী ও অমরাবতীর খোদিত মূর্তি হইতে আমরা হস্ত, পদ, কোমর, কণ্ঠ এবং মস্তক প্রভৃতির বিবিধ অলঙ্কারের নিদর্শন পাই।

সাঁচী এবং অমরাবতীতে আমরা বলয়, কঙ্কণ প্রভৃতি যে সকল অলঙ্কারের নিদর্শন পাই সেগুলি তত উন্নত পদ্ধতির নহে; অবশ্য

সাঁচী অপেক্ষা অমরাবতীর কারুকলা একটু উন্নত পদ্ধতির। ভুবনেশ্বরের কারুকলা বিশেষ উন্নত ও পরিস্ফুট।

মুকুট, কিরীট, চূড়া প্রভৃতির কারুকার্য বিশেষ সূক্ষ্ম ছিল। যাজপুরের দেবমন্দিরে 'ইন্দ্রাণী'র মুকুটের কারুকার্য অতুলনীয়। ইহা দেখি ইরানীয় টুপির (cap) মত, কিন্তু অতি সুন্দরভাবে রত্ন-খচিত।

মণিমুক্তাখচিত কারুকার্যময় নাকছবি ও নাসাঙ্গুরীক প্রভৃতি নাসিকার অলঙ্কারের প্রচলন এখনও বঙ্গদেশে এবং ভারতের সকল প্রদেশেই রহিয়াছে। একজন অন্ধ-মহিলার বর্ণনায় তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত নাসাঙ্গুরীর সঙ্গে দোলায়মান মুক্তা দুলিতেছে—এইরূপ বর্ণনা সারদাতিলকে রহিয়াছে। প্রাচীন ভাস্কর্য বা স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

ভুবনেশ্বরের প্রাচীরগাত্রে খোদিত যে সকল বড় বড় প্রতিমূর্তি রহিয়াছে, সেই সকল মূর্তিতে বিবিধ সুন্দর হারের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই হারগুলি দেখিলে বোধ হয় মণিমুক্তাখচিত বিভিন্ন আদর্শের হারের প্রচলন ছিল।

হাতে বালা-পরা বাঙালী মেয়েদের বিশেষ আদরের; বিশেষত স্বামী বর্তমানে ইংরেজ মহিলারা বিবাহের চিহ্নস্বরূপ বিবাহ-অঙ্গুরীয়ককে যেরূপ সম্মান দেয়, বাঙালী মেয়েরা তদপেক্ষা অধিক সম্মান লৌহযুক্ত স্বর্ণবলয়কে দিয়া থাকে। উৎকলে বালার পরিবর্তে খাড়ু ব্যবহৃত হয়, খাড়ু একটু বড় ও উঁচু। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে (Indo-Aryans, vol. I pp. 234, 235) ৭০ নং চিত্রে অন্য প্রকার খাড়ুর নমুনা আছে। ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪ নং চিত্রে বিভিন্ন প্রকার বালার নিদর্শন আছে। ৭৪ নং চিত্রের অনুরূপ বালা বঙ্গদেশে পটুরী নামে পরিচিত। ৭৫, ৭৬ নং চিত্রে সুপরিচিত শাঁখার চিত্র আছে, ইহা শাঁখ কাটিয়া প্রস্তুত হয়।

বর্তমানে লোকের রুচির পরিবর্তন হওয়ায় চুড়ি প্রভৃতির প্রচলন

হইয়াছে। বাজু, তাবিজ, তাড় প্রভৃতি হস্তাভরণের পরিবর্তে বাঙালী মেয়ে অন্য অলঙ্কার অথবা সাধাসিধে অলঙ্কার ধরিয়াছে। কিন্তু উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে বাজু, তাবিজ, তাড়, পেটা চুড়ি প্রভৃতি রৌপ্য ও স্বর্ণাভরণ এখনও প্রচলিত। ভগবতী ও কার্তিকেয়ের মূর্তিতে বাজু ও বলয়ের অতি উচ্চাঙ্গের নিদর্শন রহিয়াছে।

গ্রীকেরা মেখলা পরিতে ভালবাসিতেন। ইহা শুধু অলঙ্কার ছিল না, কটিবন্ধের কাজও ইহা করিত। ভারতে শুধু সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য ইহা সজ্জাভরণ রূপে ব্যবহৃত হইত, শুধু স্ত্রীলোকেরা নহে বয়স্ক পুরুষেরাও মেখলা পরিধান করিত। ইহা শুধু একটি নারীতে সীমাবদ্ধ ছিল না, অনেকগুলি নারীতে ইহার সৌন্দর্য বর্ধিত হইত। চন্দ্রহার মেখলা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শীতপ্রধান দেশে পায়ের কোনরূপ অলঙ্কার পরা কঠিন, কারণ গরম মোজা বা জুতা প্রভৃতি দ্বারা পদদ্বয় সব সময়ই ঢাকিয়া রাখিতে হয়; কিন্তু ভারতের অবস্থা ভিন্নরূপ। প্রাচীনকালে পায়ের বহুপ্রকার অলঙ্কার প্রচলিত ছিল; কিঙ্কিণী পুরুষ ও ও স্ত্রীলোকেরা উভয়েই পরিত। পাঁজর, নূপুর, গুজরি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার এখনও প্রচলিত। নূপুরের ঝুনুঝুনু এবং কিঙ্কিণীর রিণিঝিনি শব্দ এখনও শুনিতে পাওয়া যায়।

উড়িষ্যায় প্রচলিত কঙ্কমালা অনুরূপ পদাভরণ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে (Indo-Aryans) ৮৪, ৮৫ ও ৭৮ নং চিত্রের পদাভরণ শুধু উড়িষ্যা এবং তেলেঙ্গী দেশে সীমাবদ্ধ ছিল। পাঁজর মুসলমান মহিলারা এখনও পরিয়া থাকেন। ৭৮, ৭৯ এবং ৮০ নং চিত্রে ভিন্ন ভিন্ন কিঙ্কিণীর ছবি আছে। ৮১, ৮২ এবং ৮৩ নং চিত্রে ঘুন্টিকার (ঘুঙ্গুরের) চিত্র আছে।

অতি প্রাচীনযুগের নির্মিত কোন :অলঙ্কার পাওয়া যায় নাই; শুধু ভাস্কর্য চিত্রাদি হইতে আমরা মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারের পরিচয় পাই। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের বহু পূর্ব হইতেই করমণ্ডল

খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে প্রাপ্ত কয়েকটি গহনার নিদর্শন
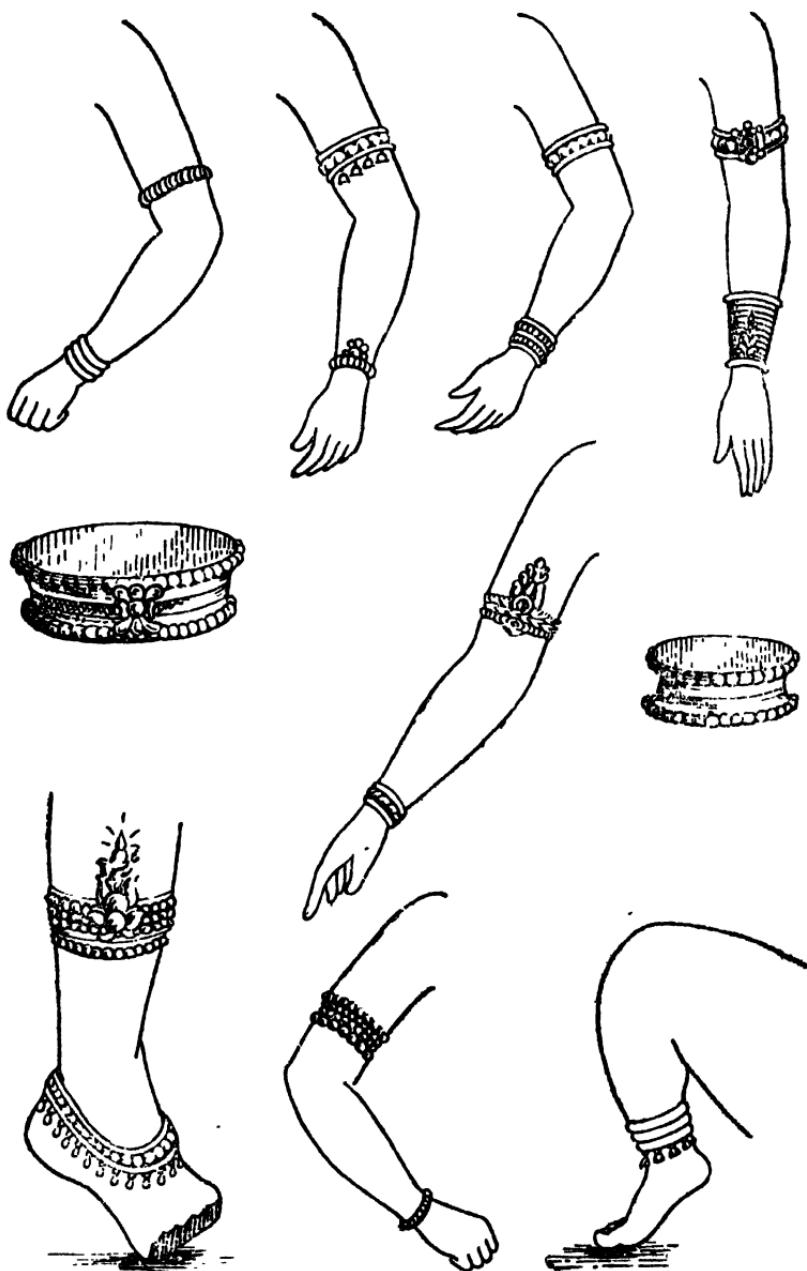
উপকূলে মুক্তা সমুদ্র হইতে আহরিত হইত তাহার প্রমাণ আমরা পাই। মনুতে মূল্যবান রত্ন ও প্রস্তরাদির উল্লেখ এবং ইহার ব্যবসায়ের কঠোর বিধান রহিয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে মণিমুক্তাদি স্বর্ণডোরে গ্রথিত করার কথা পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ ৮০০ শত বৎসর পূর্বে রচিত। মণি ও রত্নাদিকে 'কাচ' বলা হইয়াছে; কাচ বলিতে পদ্মরাগমণি, হীরক প্রভৃতিকেই বুঝাইত।

বিভিন্ন যুগের কারু-শিল্প অথবা অলঙ্কার পরীক্ষা করিয়া তাহার বিভিন্ন ধারা ও সংস্কৃতির ক্রমপরিণতি অতি সহজেই ধরা যায়।

কোন কোন আদর্শ অন্ধভাবে অনুকরণ করা হইয়া থাকে, এবং শত শত বৎসরেরও তাহার পরিণতি হয় নাই। পুরাতন হইতে নূতনে যে পরিণতি, তাহাতে সূক্ষ্মভাবে পুরাতনের আভাস পাওয়া যায়। পরিণতির একটি উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়া অনেক সময়ে শিল্পের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, শিল্পী তখন পুরাতনে ফিরিয়া যায়; এইরূপ অনেক দেশে প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ভব হইয়াছে।

বেশভূষায় দেহমণ্ডনের আকাঙ্ক্ষা সকলের মধ্যেই প্রবল। আমরা বাঙালী, আমরা আবার অলঙ্কারের অতিমাত্রায় ভক্ত। বাঙালী কতকগুলি অলঙ্কারকে পুণ্যদায়ক মনে করে। অনন্ত তাহাদের মধ্যে একটি। নবরত্নের অঙ্গুরী, অষ্টধাতুর তাগা, নাভিশঙ্খের কেয়ূর আমাদের সৌভাগ্যবর্ধন করিয়া থাকে। কতকগুলি অলঙ্কার পতিপুত্রের কল্যাণবর্ধন করিয়া থাকে, নিজের আয়াতি রক্ষণ করিয়া থাকে বলিয়া স্ত্রীলোকের নিকট সেগুলি আদর, যত্ন ও পুজা পাইয়া থাকে। শাঁখা, নথ, নোয়া—এই শ্রেণীর অলঙ্কার। সাধারণের বিশ্বাস, গলায় মাদুলী, হাতে কবচ বা তাগা, আঙুলে আংটি, পায়ে কড়া প্রভৃতি ধারণে দেবরোষ, গ্রহদোষ ও রোগশান্তি হয়, বিষদোষ নষ্ট হয়, ভূত-প্রেতের ভয় থাকে না। কোন কোন রোগ সারাইবার জন্য লোকে কুমীরের নখ সোনা বাঁধাইয়া কোমরে

ধারণ করে। কেহ বা সোনা, রূপা ও তাঁবা এক সঙ্গে জড়াইয়া অঙ্গুরী করিয়া হাতে দেয়। মৃতবৎসা রমণীরা শিশুর দীর্ঘজীবন কামনায় সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের নাক ফুঁড়িয়া সোনা রূপা বা লোহার মাকড়ি অথবা বামপদে লৌহমল কিংবা সোনার আবরণ দিয়া উচ্ছিষ্ট আমড়া, বাঘনখ ও কুমীরের দাঁত গলায় পরাইয়া দেয়।

অমরাবতীতে খ্রীঃ-পূঃ ২য়—খ্রীঃ ২য় শতাব্দীর গহনার আদিম পরিকল্পনা

আমাদের দেশে একই অলঙ্কার স্ত্রীপুরুষের ব্যবহার্য হইলে আকৃতির পার্থক্য হয়। শিশু, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার গহনার আকার ও প্রকারভেদ আছে। আমাদের দেব-দেবীর অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য নানা প্রকারের। এক দেবতার যে অলঙ্কার থাকিবে, অন্য দেবতার তাহা থাকিবে না। অলঙ্কার দেখিয়া অনেক

সময় দেবমূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দেশবিশেষের ধাতুবিশেষ, রত্নবিশেষ, অলঙ্কারবিশেষ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এইরূপ বহু ব্যবহার ও সংস্কার লইয়া আমাদের অলঙ্কারতত্ত্ব বিপুলায়তন হইয়াছে। বাঙালীর গায়ে আজকাল কিছু বেশী মাত্রায় পশ্চিমে হাওয়া লাগিয়াছে ও শিক্ষাদীক্ষার রীতিও বদলাইয়া গিয়াছে, কাজেই আদর্শ ভিন্ন পথ ধরিয়াছে। তাহার উপর কালের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। আগেকার গহনা এখন বেয়াড়া বেখাপ্পা বোধ হওয়া বিচিত্র নয়। তখনকার দিনে বাঙালীর কানের অনেক গহনা ছিল। ঝুমকোলতার ফুলের অনুকরণে ঝুমকা বা ঝুমকো[১] ; পোস্তদানার ফুলের অনুকরণে ঢেঁড়ি[২], তাহার উপর ঘণ্টার মত ঝুমঝুম করিবে বলিয়া ঝুমকো ঢেঁড়ি ; ইহার আর চলন নাই। চাঁপাফুলের অস্ফুট কলি হইতে চাঁপা[২]—ইয়ার্-রিঙ্ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। পিপুলপাত, কর্ণফুল[৩] বা কানফুল, মাকড়ি, দুল, কান, কানবালা, কনকবৌলী[৪], চৌদানি। পুরুষেরাও কানে অলঙ্কার পরিত নাম—বীর বৌলী[৫]। এ ছাড়া আরও কানের গহনা ছিল। কণ্ঠাভরণ ছিল—মটরমালা, ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় আজকাল চলন হইয়াছে। আর ছিল চাঁপাকলি—এটি চম্পক-কলিকার মালা, বোঁটায় বোঁটায় গাঁথা দেখিতে অনেকটা নেকলেসের মত। হংসগ্রীবার অনুকরণ করিয়া হাঁসুলী[৬] ; নির্বিষ হেলে সাপের লেজের অনুকরণে হেলেহার,

১ হিন্দুস্থানীদের মধ্যে আছে ঝুমক, ঝুম্মক।

২ 'ঢেড়ি চাঁপি মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল'—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

৩ 'সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।—হিন্দুস্থানীদের 'করনফুল', 'কনফুল'।

৪ 'সুবর্ণের কড়ি বৌলি রজতমুদ্রা পাশুলি সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ'—চৈতন্যচ° আদি।

৫ হিন্দুস্থানীদের 'বীড়'।

৬ হিন্দুস্থানীদের হঁসুলী।

কামরাঙা-হার, দড়াহার, কণ্ঠমালা, মুক্তামালা, তেনরী, ধুকধুকি, পাঁচ লহর বা পাঁচ হালীর পাঁচনরী, সাতনরী, দানা, মোহনমালা, ঝিলিমিলি হার[৭], প্রভৃতি অনেক রকমের হার ছিল। মেয়েদের কটিভূষণ ছিল—কিঙ্কণি[৮], গোট, কোমরপাটা, মেখলা, চন্দ্রহার। শিশুদের কটিভূষণ ছিল নিমফলের মত দানাওয়ালা নিমফল, কুলের আঁটির মত দানাগাঁথা সোনা-রূপার বোর, বোরপাটি, বোরপাটা—এগুলি বোর ও তাবিজের মত সোনা-রূপার পাতা গাঁথা; তেঁতুলে বিছার অনুকরণে বিছা। তেঁতুলে বিছার আকৃতি হারও ছিল, তার নামও ছিল বিছা—নিমফুলের অনুকরণেই হার নিমফুল। শিশুদের কোমরে বেঙও দেওয়া হইত। আবার গোঁপ-হারও ছিল। গোঁপ-হারের কল্পনা কিছু উদ্ভট বা উৎকটও মনে হইতে পারে; গোঁপের সঙ্গে এ হারের কোন সম্বন্ধ নাই—পশ্চিমবঙ্গের অনুনাসিকের পাল্লায় পড়িয়া হিন্দুস্থানী পুরুষদের গোপ নামক হার আমাদের মেয়েদের গোঁপহার হইয়াছে। যাহা হউক, রমণীদের করতলপৃষ্ঠের শোভা-বর্ধন করিতে রতনচূড়, তাঁহারা হাতে পরিত পলাকাঁটি, যবদানা, মরদানা, মুড়কি আকারে গড়া মুড়কি মাদুলী, মটরীকঙ্কণ খৈয়ে নোয়া; কঙ্কণ, খাড়ু, নারিকেল ফুল, বালা, শাঁখা[৯], লবঙ্গফুল, পেঁছা, বাউটি; উপর হাতে পরিত তাড়[১০], তাগা, বাজু[১১], জসম, ইত্যাদি। কুলুপা শঙ্খ অনেক দিন আগে বাঙলায় চলিত। এটি নাচি-করা শাঁখা। সাধারণত দু-সেট হইত। এক সেট হলদে, এক সেট সবুজ। হলদে সেটকে লক্ষ্মণ বলিত, সবুজ সেটের নাম

৭ 'গলায় তাহার ছিল হার ঝিলমিলি'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৮ 'কটিতে কিঙ্কিণিধ্বনী শুনি মনোহর।'—ঘনরাম।

৯ 'শঙ্খের উপর সাজে সোনার কঙ্কণ।'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

১০ 'ভুজে বিরাজিত তাড় ভুবন উজর'—ঘনরাম।

১১ 'নানা ছন্দে বাজুবন্দ হেম ঝাঁপাঝুরি। পরিয়া পাইল শোভা পরম সুন্দরী'—শিবায়ন।

রাম। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণে আছে "কুলুপা তু-বাই শঙ্খ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ"। বাই মানে সেট। মাথার অলঙ্কার ছিল, সিঁথি, ঝাঁপা, ঝাপ্‌টা[১২], শিরোমণি, খোঁপার শোভা ছিল—প্রজাপতি, ফুল, চিরুনি, কাঁটা; রমণীদের নাসাশোভা ছিল নোলক, নথ, বেশর[১৩], লবঙ্গ, শতেশ্বরী ইত্যাদি। পায়ের গহনা ছিল, মল, বেঁকি, বাঁকমল,* ঘুমুরগাঁথা মল, ঘুঙ্গুর পাতামল, হীরাকাটা মল, নূপুর[১৪], নেউর, কেয়ূর, পাশুলি, আনট বিছা[১৫], গুজরিপঞ্চম, পঞ্চম, পাঁজর, মঞ্জীর, তোড়া, খলখলি, ছরা, ঝুমুর চরণচাপ প্রভৃতি। পায়ের বুড়ো আঙুলের গহনা আঙ্গট, কড়া, চুটকি। হাতের আঙুলের আংটি, মুদরি ইত্যাদি।

১২ 'মাথায় ঝাপ্‌টা সিথী কটিতটে ধেড়ি চন্দ্রহার।'—মাইকেল।

১৩ 'নাকেতে বেশর ছিল মুক্তা সহকারে।'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

'বেশর খচিত—শতেশ্বরী পরিহর।'—ভূপতিনাথের পদ।

'লবঙ্গ বেশরে কারো মুখ করে আলো'—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

* 'দুবাহুতে দিব্যশঙ্খ রজতের মলবঙ্ক স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ।' চৈতন্যচ° আদি। 'দুবাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ।'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

১৪ 'দুই পায়ে দিল তার রজত নূপুর।'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

১৫ 'পাতামল, পাশুলি আনট বিছা পায়। গুজরি পঞ্চম আর শোভা কিবা তায়।'—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

প্রাচীন ভারতে গ্রাম্য সমিতি

প্রাচীন ভারতে রাজশক্তি যথেচ্ছাচারের পোষণ করিতে পারিত না। রাজশক্তির পার্শ্বে জনসাধারণের মতের একটা প্রতিষ্ঠা ছিল। তাহার নাম ছিল 'সভা' ও 'সমিতি'। সভা ছিল সামাজিকভাবে মেলা-মেশার কেন্দ্র—আর সমিতি ছিল সমগ্র জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ বাণী। সমিতিতে রাজাকে উপস্থিত হইতে হইত। প্রয়োজন হইলে সমিতি রাজা নির্বাচন করিয়াও দিত। পরবর্তীকালে রাজশক্তি সঙ্কুচিত করিবার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা মহাভারতে (শান্তিপ° ৮৫, অ° ৭-১২) পাই। রাজকার্য পরিচালনের জন্য অমাত্য-সভা ছিল। এই অমাত্যদিগের পরামর্শ না লইয়া কোন কিছু করিবার অধিকার ছিল না। অবশ্য এই সভায় রাজা নেতৃত্ব করিতেন। এই সভায় থাকিত চারিজন ব্রাহ্মণ, আটজন ক্ষত্রিয়, একুশজন বৈশ্য, তিনজন শূদ্র ও একজন সূত। এই সাঁইত্রিশ জনের মধ্যে আটজন আইন-কানুন গঠনে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিবেন। যাহা হউক, ইহার পূর্বে বৈদিকযুগে রাজশক্তি যে যদৃচ্ছাক্রমে কার্য করিতে পারিত না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পরবর্তী সংহিতা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সময়েও সভা, সমিতির প্রতাপ প্রবল ছিল। প্রয়োজন হইলে ইহারাই রাজাদিগকে পদচ্যুত পর্যন্ত করিতে পারিত। আপস্তম্বে লিখিত আছে রাজা 'পুর' (নগর) নির্মাণ করিবেন। পুরের অভ্যন্তরে তাঁহার 'বেশ্ম' (প্রাসাদ) থাকিবে। বেশ্মের দ্বার হইবে পূর্ব মুখ। পুরের দক্ষিণে 'সভা' সংস্থিত থাকিবে। সভার ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। মহাভারত যুগে কিন্তু এই সভামাত্র যোদ্ধৃ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাজা ও তাঁহার অন্তরঙ্গ মিত্রগণ কর্তব্য

মীমাংসা করিয়া লইতেন। কেবল পরামর্শ হিসাবে সভার মত লইতেন।

একই বংশের বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি ছোট-ছোট অনেকগুলি বাড়ী লইয়া 'গ্রাম' তৈয়ারী হইত। গ্রামের চারিদিকে বেষ্টনী দিয়া অথবা অন্য কোন উপায় শত্রু বা বন্য জন্তুর আক্রমণ হইতে গ্রামকে সুরক্ষিত রাখা হইত। পুর ছিল গ্রামের একটি অংশ। মাটির গড় দিয়া পুর ঘেরা থাকিত। পুরের চারিদিকে বৃত্তাকারে এক বা ততোধিক প্রস্তরাদি নির্মিত দুর্গও থাকিত। গ্রামের চেয়ে বড় ছিল 'বিশ্'। কয়েকটি 'বিশ্' একত্র করিলে যাহা হইত তাহার নাম ছিল 'জন'। জনকেও কখন কখন গ্রামও বলা হইত। 'ভরত'রা কোথাও 'জন' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, কোথাও আবার 'গ্রাম' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। 'বিশ্' আকারে গ্রামের চেয়ে বড় ছিল বটে, কিন্তু গ্রাম যে বিশের অধীন ছিল, একথা বলা যায় না। গ্রাম বলিলে যে সম্পূর্ণ বিশ্ বা কতকগুলি বিশের অংশ বুঝাইত, ইহাও বলা যায় না।

প্রাচীন ভারতে গ্রামের চারিটি বিভাগ ছিল বলিয়া বোধ হয়। মানসার নির্দেশ করিয়াছে যে, গ্রামের ব্রাহ্ম্য, দিব্য, মনুষ্য ও পৈশাচ এই চারিটি বিভাগ। ব্রাহ্ম্য বিভাগে ১ম ব্রাহ্মণ, দিব্য বিভাগে ১ম ক্ষত্রিয়, মনুষ্য বিভাগে ১ম বৈশ্য ও পৈশাচ বিভাগে ১ম শূদ্র থাকিবে। যে গ্রাম বা পুর সম্পূর্ণ ছিল না, তাহার এরূপ বিভাগও থাকিত না। শুক্রনীতির (১ম অ° ৫৬, ৫৭ শ্লোক) নির্দেশ আছে যে, গ্রামে বা নগরে এক এক জাতির বাড়ী শ্রেণীবদ্ধ আকারে থাকিবে আর সে পঙ্ক্তির নাম হইবে 'সমুদায়'। বাজারে এক এক রকমের দোকান (আপনি) পৃথক্ পৃথক্ পঙ্ক্তিতে সাজান থাকিবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও (২, ৪) নির্দেশ আছে যে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় পৃথক্ পৃক্ক্ স্থানে থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ব্যবসায়ীরা স্বতন্ত্র স্থানে থাকিবে। কেবল চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নতম জাতিরা

তাহাদের কৃত ঘৃণ্য কর্মের জন্য গ্রামের বাহিরে থাকিবে (অর্থশাস্ত্র, ৪.২)। বৌদ্ধযুগে গ্রামগুলি ধানক্ষেতের ধারে ধারে কতকগুলি কুটীর লইয়া সংস্থিত থাকিত। দুইখানি গ্রামের মধ্যে একটি মহাবনের ব্যবধান থাকিত।

গ্রামে ছোট ছোট মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে 'গ্রাম্য-বাদী'রা বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করিতেন। গ্রামে একজন যোদ্ধৃ কর্মাধ্যক্ষ ও কিছু সেনা থাকিত। ইহাদের কাজ ছিল গ্রাম রক্ষা করা। প্রত্যেক গ্রামের একজন অধিপতি থাকিত। অধিপতিকে 'গ্রামণী' বলিত। গ্রামণীর military ও civil উভয় ক্ষমতাই ছিল। এছাড়া একটি গ্রামের যিনি অধ্যক্ষ তাহার নাম হইত 'গ্রামিক'। দশটি গ্রামের অধ্যক্ষ 'দশপ' নামে পরিচিত হইত। একটি পরিবারের উপযোগী শস্য গ্রামিক ভোগ করিত। 'গ্রামভোজক' শস্যের কর নির্ধারণ করিয়া দিত।

গ্রামের সমুদায়গুলি পাড়া বা মহল্লার অনুরূপ। এক একটি সমুদায়ে যতগুলি পরিবার বাস করিত তাহাদের সামাজিক ও ব্যবসায়িক ঐক্য ছিল। সমস্ত সমুদায় বা পাড়া একটি পরিবারের মত ছিল। সমস্ত পাড়া যেন একটি পরিবার। পাড়ার লোকেরা সারাদিনের কাজেব শেষে এক জায়গায় মিলিত হইত। তাহাদের সামাজিক ও ব্যবসায়িক জীবন কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইত। আর সেই নিয়মগুলি সকলেই ধর্মজ্ঞানে পালন করিত। পাড়ায় সকলে পরস্পর বিবাহ, পান, ভোজন প্রভৃতি বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত। সামাজিক আইন-কানুন সকলেই শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া চলিত। কাহারও অবস্থা হীন হইলে সাহায্য পাইত। পরস্পরের সাহায্য ও স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য তাহারা বার্তিক নিয়ম মানিয়া চলিত। এ সকলের জন্য সমিতি বসিত। মন্দির, পুণ্যশালা, ধর্মশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি পরিচালনের জন্য তাহাদের সভা, সমিতিতে রীতিমত বৈঠক চলিত।

তখন গ্রাম ও নগর একই নিয়মে চলিত। গ্রামের লোক শহরে আসিয়া ফাঁপরে পড়িত না। সেখানে সে নিজের জাতির, সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ের লোক পাইত। সেখানে সে দেখিত নাগরিক জীবন তার গ্রাম্য জীবনেরই অনুরূপ। এখন লোক নাগরিক জীবনে সামাজিক নিয়ম, সম্পর্ক ও দায়িত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত মনে করে, কিন্তু পূর্বে তাহা করিত না। সমাজের প্রতি কর্তব্য সকল সময় তার মনে উদ্বুদ্ধ থাকিত। সমাজ তাহাকে ভুলিত না, সেও সমাজকে ভুলিতে পারিত না। যদিও জাতি ও ব্যবসায়ের ভিত্তির উপর গ্রাম ও নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যেক গ্রাম নিজের নিজের বন্দোবস্ত করিত; নিজেদের পরিচালন ভার নিজেদের উপর রাখিত। গ্রামগুলি পরস্পরের প্রতি অথবা নগরের প্রতি কর্তব্য কখনও ভুলিত না।

প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম ও বিধি ব্যবস্থায় ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য স্বীকৃতি হইত না এবং সেই সকল বিধি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বকে বাড়াইয়া তোলা হইত না। পূর্বে বলিয়াছি রাজা শাসন করিতেন, ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থার বিধিসঙ্গত গণ্ডির মধ্যে যাহাতে প্রজাসকল আবদ্ধ থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিতেন, কিন্তু সেগুলি কেবল তাহার স্বাধীন ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিত না। সে সকল বিধি-ব্যবস্থার যথার্থ নিয়ন্তা ছিল শাস্ত্র। আর সে সকল শাস্ত্র-নির্দিষ্ট নিয়মের বিনিয়োগ বা প্রবর্তন ব্যাপারের কর্তা ছিল এক একটা সঙ্ঘ। রাজা তাহার প্রধান ব্যক্তি হইলেও তিনি সে সকল বিষয়ে স্বেচ্ছাচার করিতে পারিতেন না; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির মধ্য হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া যে একটি সঙ্ঘ বা মন্ত্রণা সভা থাকিত, রাজা তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া সমবেতভাবে রাজকার্য পরিচালন করিতে বাধ্য থাকিতেন। রাজা রাজকীয় কার্যে যে কেবল মন্ত্রণা সভারই নির্দেশ মানিতেন তাহা নয়; কোথাও কোথাও দেখা যায় রাজ্য-

শাসন সম্বন্ধে অতি গুরুতর বিষয়েও তিনি সাধারণ প্রজাবর্গেরও মতামতের 'অপেক্ষা' করিতেন; রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেকের সময়ে রাজা দশরথের সে বিষয়ে প্রজাবর্গের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাহাদের আহ্বানই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া যে কোন একটি বিশেষ জাতি বা কোন একটি বিশেষ ব্যক্তিকে বাড়াইয়া তোলা হইত না। ইহা তাহার একটি প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতে ব্যবস্থাপকেরা মানিতেন—সমগ্র সমাজ একটি অখণ্ড বস্তু। সমাজের প্রত্যেক জাতি বা প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই এক একটি অঙ্গস্বরূপ। বাড়াইতে হইলে সমগ্র সমাজকেই বাড়াইতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি সমাজের কোন একটি অঙ্গ, কোন বিশেষ জাতি বা ব্যক্তিকে বাড়ান যায় আর সমাজের অন্য অংশ পূর্ববৎ অবর্ধিতই থাকে, তাহা হইলে সে সমাজে তাহার স্থান নাই। তাহার বর্ধিতায়তন রক্ষা করিতে হইলে তাহার যতটুকু অবকাশের প্রয়োজন অপর অংশ হইতে তাহা লাভ করা তাহার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, সমাজের অন্যান্য অংশ বা অঙ্গের সহিত তাহার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ অপরিহার্য। তাহার ফলে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট এমন কি অবস্থা-বিশেষে সত্তালোপ পর্যন্ত অসম্ভব নয়। এই জন্যই প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থাপকেরা সর্বদাই এ বিষয়ে সাবধান থাকিতেন; যাহাতে সমাজে ব্যক্তি অসম্ভবরূপে আস্পদ লাভ করিয়া স্ফীত হইয়া না উঠে তাহার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের বিধি-ব্যবস্থার ফলে সমগ্র সমাজটাই বাড়িয়া উঠিত। সমগ্র সমাজ বাড়িয়া উঠার অর্থ সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাড়িয়া উঠা। সমাজ ব্যক্তিরই সমষ্টিরূপ। এই রূপে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যথানিয়মে থাকিলে সমগ্র সমাজের আয়তন বৃদ্ধি পাইত। তাহার ফলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় স্বীয় বর্ধিতায়তন রক্ষা করিতে যথাযোগ্য অবকাশ লাভ করিত। কাহার সহিত কাহারও বিরোধ

বাধিত না। সমাজের সর্বত্রই একটা নিয়ম বা শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। সমাজের সর্বত্র একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত। প্রাচীন ভারতের গ্রাম্যসমিতি হইতেই সমাজ তথা দেশ শাসিত হইত।

প্রাচীন ভারতে নগর সম্পূর্ণরূপে গ্রামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিল। গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিতে নগরের শ্রীবৃদ্ধি ও নগরের শ্রীবৃদ্ধিতে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হইত। গ্রামগুলি বাহির হইতে দেখিতে যেন স্বতন্ত্র ছিল, যেন গ্রাম গ্রামেরই কার্য করিত। আচার, ব্যবহার ও সামাজিকতায় গ্রামগুলি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করিয়া চলিত। কিন্তু নগর ছিল কেন্দ্রস্বরূপ; এই কেন্দ্র হইতেই সকল সরল রেখারই সাম্রাজ্যরূপ বৃত্তরেখার সকল অংশের সহিত সমান সম্বন্ধ ছিল। গ্রাম সকলের সমষ্টিভূত শক্তি সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিত সুতরাং গ্রামের ধ্বংসের সহিত নগরের এবং সেই অনুপাতে সাম্রাজ্যের ক্ষতি হইত। এক অতি বিচিত্র কৌশলে সেকালে সাম্রাজ্য একতাবন্ধনে আবদ্ধ থাকিত। তখন নগরবাসী আপনাকে নিজ গ্রাম ও সমাজের অধীন বলিয়াই জানিত—নগরের সহিত কর্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সমাজকে দূরে ঠেলিতে পারিত। নগরেও সে তাহার সামাজিকতা রক্ষা করিতে বাধ্য হইত। এখন আমরা নগরে থাকিয়া স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলি। তখন কিন্তু এত সহজে স্বাতন্ত্র্য হারাইতে পারিত না। ইহার ফলে তখন একতার বন্ধন দৃঢ় ছিল এবং সকল গ্রামকে প্রত্যক্ষভাবে নগরের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে গিয়া গৌণভাবে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইত। সুপ্রাচীন কালের না হইলেও দৃষ্টান্তস্বরূপ পাটলিপুত্র নগরের কথা বলা যাইতে পারে। আমরা মেগাস্থিনিসের বিবরণ অবলম্বনে বলিতে পারি যে, উক্ত নগরের ত্রিশজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনর সকল গ্রাম হইতেই নির্বাচিত হইত। গ্রামের যাঁহারা মণ্ডল তাঁহারা ঐ পদে অভিষিক্ত হইতেন। কমিশনাররা বিভিন্ন গ্রাম ও বিভিন্ন সমাজের নেতা হইলেও নগরের

কার্য পরিচালন করিতে গিয়া সাধারণভাবে ও সাম্রাজ্যের সাধারণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশের শ্রমিকশিল্প, বাণিজ্য ও কর সংগ্রহ প্রভৃতি সাধারণ কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। একদিকে তাঁহাদের যেমন স্বগ্রাম ও স্ব-সমাজের প্রতি লক্ষ্য ছিল, অপর দিকে তেমনই তাঁহাদের জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য ছিল। এত বড় কার্যের খুঁটিনাটি সভা, সমিতির ভিতর দিয়াই সূচিত হইত। সভা, সমিতি প্রজার কল্যাণপ্রদ বলিয়া সর্বমঙ্গলনিদান প্রজাপতির কন্যা বলিয়া অথর্ববেদে (৭. ১২. ১) বর্ণিত হইয়াছে।

"সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্দুহিতরৌ সংবিদানে।"

প্রাচীন ভারতের সকলকেই প্রত্যহ অপরাহ্নে সভা-সমিতিতে যাইতে হইত। সেখানে সাধারণত আমোদ, প্রমোদ, ক্রীড়া, তর্ক, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতি হইত। এ ছিল নিত্য ব্যাপার। ইহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে নৈমিত্তিক ব্যাপারও হইত। এই নৈমিত্তিক ব্যাপারে ধর্ম, সমাজ বা রাজনীতি সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়ে আলোচনা হইত। এই নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'সমিতি-সমবায়', পরে ইহা 'গোষ্ঠীসমবায়' নামে অভিহিতও হইয়াছিল। শাসন ব্যাপারেও সভা, সমিতি যথেষ্ট কার্য করিত। তখনকার নিয়ম ছিল যে, নগর বা গ্রামের মধ্যভাগ দিয়া একটি উত্তর দক্ষিণ ও আর একটি পূর্ব পশ্চিম মুখে দুইটি বড় রাস্তা যাইবে। দুই রাস্তায় যেখানে সংঘর্ষ সেইখানে ব্রহ্মার মন্দির বা সাধারণ মিলনের স্থান 'মণ্ডপ' তৈয়ার করা হইবে। এই মণ্ডপে সভার অধিবেশন হইত। শুক্রনীতি বলে নগরের মধ্যভাগে 'সভা' সংস্থিতি থাকিবে। বস্তুতঃ গ্রামে ও নগরে সভার স্থান। সভা, সমিতির মঙ্গলপ্রদ কেন্দ্র যে প্রাচীন ভারতে দেশের ও দশের স্নেহাস্পদ হইয়া প্রভূত উপকার করিয়াছিল, তাহা কে না স্বীকার করিবে?

প্রাচীন ভারতের পুথি ও পুথিশালা

ভারতবর্ষে পুথি প্রাচীনকালে ছিল। কতকাল পূর্বে ছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে লোকবৃত্তপ্রসঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় পুস্তক-বাচনের প্রথার উল্লেখ আছে। পুস্তক-বাচন করিতে হইলে পুথি মুখস্থ করিয়া আওড়াইতে হইত। ঐ সময়ে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সভা-সমিতি থাকিত, লোকেরা প্রতি সন্ধ্যায় আসিয়া সেখানে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিত। আমোদের মধ্যে পুস্তক-বাচন—মুখস্থ পুথি আওড়ান একটি নিত্যকর্ম ছিল।

বাবিলনে, আসিরিয়ায় ও মিসরে খ্রীষ্টাব্দের ৩০০০ বৎসর পূর্বেও যে পুথিশালা ছিল, তাহার মুখ্যভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক বা বৈদিকযুগের অব্যবহিত পরে পুথিশালা ছিল কিনা, তাহার মুখ্য বা গৌণ কোনরূপই প্রমাণ আমাদের নাই। সকলের চেয়ে পুরাতন পুথিশালা মিসরেই ছিল বলিতে হয়। মিসররাজ Memphisএর Osymandyas এই পুথিশালা স্থাপন করেন। পুরাতন যুগে Alexandrian Libraryই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থগার ছিল। ইহাতে ৪০০,০০০ বই ছিল। ইহার পর Pergamonএর রাজাদের গ্রন্থাগারের নাম করা যাইতে পারে। ইহার গ্রন্থসংখ্যা ২০০,০০০। দুঃখের বিষয়, এই সময়ে ভারতের কোন গ্রন্থশালা ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতের শিক্ষাদীক্ষা প্রাচীন জগতের কেন্দ্রস্থান ছিল, একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এক সময়ে এশিয়ার শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রভূমি ছিল তক্ষশিলা, বারাণসী, কৃষ্ণাতীরবর্তী শ্রীধন্যকটক, নালন্দা, বিক্রমশিলা ও ওদন্ত-পুরী। কিন্তু প্রাচীন যুগের পুথিশালা সম্বন্ধে বলিতে হইলে বলিতে

হয়—বাবিলন, আসিরিয়া ও মিসর এবং এমনকি, গ্রীক ও রোমের পরও ভারতের স্থান।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গান্ধার মধ্যবর্তী তক্ষশিলা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ও অন্যান্য শিক্ষার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ইহা বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি (Rawalpindi) হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে। ব্রাহ্মণ ও বড় বড় লোকের ছেলেরা শিক্ষার জন্য এখানে আসিত। তক্ষশিলার ছাত্ররাও বারাণসী ও পাটলিপুত্রে পড়িতে যাইত। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছাত্রেরা তক্ষশিলায় পড়িয়া, সেখান হইতে বারাণসী ও পাটলিপুত্রে যাইত। তক্ষশিলার তীক্ষ্ণধী ছাত্রেরা কখন কখন বারাণসীতে গিয়া শিক্ষকতাও করিত। যখন শিক্ষকেরা ছাত্র পড়াইতেন বা কাহারও সঙ্গে কোন বিশেষ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন, তখন তাঁহাদের হাতে বেশ সুন্দরভাবে বাঁধান বই থাকিত। বর্ষ, উপবর্ষ ও পাণিনি প্রথমে তক্ষশিলার ছাত্র ছিলেন। পরে তাঁহারা তক্ষশিলা ত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্রে গমন করেন। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় এ কথা লেখা আছে। এই সমস্ত বিদ্যাপীঠে নিশ্চয় পুথিশালা ছিল। গান্ধারের তক্ষশিলায় লেখা একখানা পুথি সম্প্রতি খোটানের নিকটে গোসিঙ্ (Gosing) নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্য এশিয়ায় কুষাণযুগের গোড়ার দিকের কয়েকখানি বৌদ্ধ নাটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি তিনটি বিদ্যাপীঠের কোন একটিতে লেখা হইয়াছিল। আরও আগেকার ভারতীয় পুথি মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধমঠে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে Dr. Stein মধ্য-এশিয়া হইতে অনেকগুলি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ পুথি আবিষ্কার করিয়াছেন।

চীনা বৌদ্ধভিক্ষু ও তীর্থযাত্রীরা বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতে আসিতেন। সর্বপ্রথম ফা-হিয়ন (Fa-Hian) চীনের পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী চ'ঙ্-অন (Ch'ang-an) হইতে ৩৯৯ খ্রীঃ

যাত্রা করেন এবং ছয় বৎসর পরে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বৌদ্ধদের ৩০টি পবিত্র স্থান দর্শন করেন। তিনি একসঙ্গে ২।৩ বৎসর পাটলিপুত্র ও তাম্রলিপ্তির বিদ্যাপীঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইখান হইতে তিনি সিংহলে গমন করেন। তথা হইতে তিনি চীনে ফিরিয়া যান।

বৌদ্ধদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ এই সকল স্থান হইতে সংগ্রহ ও নকল করেন। যে সমস্ত মঠে তিনি গিয়াছিলেন, সেগুলি খুব বড় ছিল—মঠগুলিতে ৬০০।৭০০ ভিক্ষু থাকিত। পাটলিপুত্রে অবস্থান কালে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৌদ্ধদের বিনয়পিটক লিখিয়া লন। তিনি সেখানে মহাসঙ্ঘিকবাদীদের নিয়ম, সর্বাস্তিবাদীদের ৬০০০।৭০০০ গাথা, সংযুক্তাভিধর্মহৃদয়সূত্র, পরিনির্বাণবৈপুল্লসূত্রের একটি অধ্যায় (৫০০ গাথা), মহাসঙ্ঘিক অভিধর্ম এবং ২৫০০ গাথায় সম্পূর্ণ একটি সূত্র তিনি দেখিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীনতম পুঁথিশালার নিদর্শন ইহার পূর্বে আর কোথাও পাওয়া যায় নাই।

ফা-হিয়ানের ২০০ বৎসর পরে চীন পরিব্রাজক য়ুয়ন চয়ঙ (Yuan-Chwang) ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ষোল বৎসর (৬২৯-৬৪৫) ধরিয়া মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। সি-য়ু-চি (Hsi-yu-chi) নামক পশ্চিমদেশ-বিবরণ গ্রন্থে বৌদ্ধদের বিদ্যা ও আচার বিশেষ করিয়া বর্ণিত আছে। ভারতবর্ষে কান্যকুব্জরাজ হর্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ভারতের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করেন। মহাযানবিদ্যাকেন্দ্র নালন্দায় তিনি শীলভদ্রের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন; এইখানে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি একটি প্রাচীন সঙ্ঘারাম দর্শন করেন। এখানে অনেক মঠ ও মন্দির ছিল। ১৮ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা সেখানে থাকিত। হিরণ্যপর্বতে গঙ্গাতীরে তিনি একটি নগর দর্শন করেন। এখানে ১০টি সঙ্ঘারাম ও ৪০০০ হীনযান

সম্মিতীয়বাদী দর্শন করেন। তাম্রলিপ্তিতে ১০টি মঠে ১০০ জন ভিক্ষু দেখেন। এইরূপে নালন্দা প্রভৃতি বহুস্থানে মঠাদি অবলোকন করেন। যুয়ন-চয়ঙ্ চীনা শাস্ত্রের বড় বড় বাণ্ডিল পুথি লইয়া যান। ভারতে কত বড় বড় পুথিশালা ছিল, তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থের তালিকা হইতে বেশ বোঝা যায়। তিনি মহাযান-সূত্রের ২২৪ খানি, মহাযান-শাস্ত্র ১৯২ খানি স্থবিরবাদীদের গ্রন্থের ১৪ খানি, মহাসঙ্ঘিকবাদীদের ১৫, সম্মিতীয়বাদীদের ১৫, মহীশাসক-বাদীদের ২২, কাশ্যকীয় গ্রন্থ ১৭, ধর্মগুপ্তীয় গ্রন্থ ৪২, সর্বাস্তি-বাদীদের ৬৭, হেতুবিদ্যা ৩৬, শব্দবিদ্যা ১৩ খানি অর্থাৎ ৬৫৭ খানি গ্রন্থের ৫২০টি বাণ্ডিল পুথি চীনদেশে লইয়া যান। তাকাকুসু (Takakusu) প্রদত্ত তালিকা হইতে এই সংবাদ পাওয়া যায়।

৭ম শতকের শেষে চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিঙ্ (I-tsing) নালন্দা বিদ্যাপীঠে ১০ বৎসর (৬৭৫-৬৮৫) বিনয়গ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত করেন। তিনি বলেন, একমাত্র মঠেই ৩০০০ ভিক্ষু থাকিত। নালন্দাতে ৮টি হল ছিল, তাতে ৩০০টি ঘর ছিল। এখানে কখন কেমন করিয়া অধ্যয়নাদি হইত, তাহার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে।

এখন দেখা গেল যে, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম শতকে বৌদ্ধ মঠগুলিতে নানা রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আবার আর একদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয়ের সময় ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যথেষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। গুপ্তদের হিন্দুবংশের রাজত্বকাল ৩২০ খ্রীঃ। সমগ্র উত্তর ভারতে ইঁহাদের আধিপত্য ছিল। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে হূনদের আক্রমণে এই রাজত্বের ধ্বংস হইয়াছিল বটে, কিন্তু হিন্দুসম্রাট্ হর্ষ গুপ্তরাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই গুপ্তদের রাজ্যকালে দেশের চারিদিকে হিন্দুমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। হেমাদ্রি প্রভৃতি স্মৃতিকাররা হুকুম জাহির করিলেন যে, মন্দিরে পুস্তকদানে মহাপুণ্য। অমনি দলে দলে লোকে পুথি দিয়া মন্দির পূর্ণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরগুলি এইরূপে এক একটি পুথিশালা হইয়া

দাঁড়াইল। এই সময়ে পুথিদানের নজিরও বিরল নয়। ৫৬৮ সালের বলভী-লিপিতে এইরূপ দানের উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগে মন্দিরগুলি গ্রন্থভাণ্ডার হইয়া উঠিল। ৬৫০ খ্রীঃ হইতে ১০০০ খ্রীঃ মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বত্র পুথিসংগ্রহ একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর এই সময় ভারত বহু রাজ্যে বিভক্তও হইয়াছিল।

পুরাতন পুথিশালা প্রথমে দুই রকমের ছিল—কতকগুলি মঠের সংলগ্ন, কতকগুলি মন্দিরের সংলগ্ন। তারপর যখন রাজাদের অনুগ্রহে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য খুব বাড়িয়া উঠিল, তখন সম্ভ্রান্ত লোকেরাও নিজেদের বাড়ীতে ভাল ভাল পুথির সংগ্রহ রাখিতে লাগিলেন। নালন্দা বিদ্যাপীঠে অনেকগুলি সুবৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ পুথিশালা ছিল। ৪র্থ শতকে নালন্দা একটি ছোট গ্রাম মাত্র। কিন্তু এই সময়ে সিংহলরাজ মঘবর্মা সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকালে (৩৩০-৩৭৫) আম্রবনে প্রকাণ্ড বিহার নির্মাণ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ৭ম শতকে য়ুয়ন-চয়ঙ্ যখন ভারতে আসেন, তখন ইহার খুব নাম। চন্দ্রপাল গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, পদ্মসংস্থ ও বীরদেব এই নালন্দায় অধ্যয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। দিঙ্নাগ নালন্দায় অনেক কাল কাটাইয়াছিলেন। এখানে 'রত্নোদধি'তে পুথি সংরক্ষিত থাকিত। রত্নোদধি হীনযান ও মহাযানদের ৯ তলা মন্দির। ১৯১৫-১৬ সালের Arch. Reportএ উল্লেখ আছে যে, খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে যে, ঘরগুলি ১২ ফুট × ১৮ ফুট। এই বিরাট্ পুথিশালাটি কেমন করিয়া নষ্ট হইয়া গেল, তাহা জানা যায় না। তিব্বতে একটি প্রবাদ আছে যে, তৈর্থিক ভিক্ষুরা রত্নোদধি পুড়াইয়া ফেলে। যাহা হউক, ৯ম শতকে নালন্দা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কিন্তু এটা ঠিক যে, তখন ইহা বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল না। এই সময় পাল-রাজাদের চেষ্টায় দুইটি বিরাট বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়—একটি বিহারের ওদন্তপুরীতে, আর একটি গঙ্গার উত্তর-তীরে বিক্রমশিলায়। ওদন্তপুরীরাজ গোপাল বিহার নির্মাণ করিয়া দেন ; পালবংশের ২য়

রাজা ধর্মপাল (৮০০ খ্রীঃ) বিক্রমশিলায় বিদ্যাপীঠ ও গ্রন্থভাণ্ডার নির্মাণ করিয়া দেন। ইহা তান্ত্রিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ন্যায় ও ব্যাকারণও এখানে পড়া হইত। বিক্রমশিলায় সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় তর্জমা করা হয়। তিব্বতী পণ্ডিতরাও এখানে অধ্যয়ন করিতেন। তিব্বতের সাহিত্য এক বিরাট্ ব্যাপার। নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার পুথিশালা হইতেই তিব্বতীয় বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি। ওদন্তপুরীর পুথিশালা বিহারের মন্দিরেই অবস্থিত এবং নালন্দার পুথিশালার চেয়ে বড়। এই চমৎকার পুথিশালাটি ১২০২ সালে বখতিয়ার খলজীর এক সেনাপতি পুড়াইয়া দেন। তখন বিভিন্ন বিহারের অধিকাংশ ভিক্ষু নেপালে ও তিব্বতে পলাইয়া যায়।

প্রাচীনকালের পুথি বা পুথিশালা সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় না। ১০ম ও ১১শ শতকে চীনে একটি খুব বড় বৌদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। এখানে ভারতীয় ভিক্ষুরা গিয়া চীনা ভাষায় ভারতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ তর্জমা করিত। উদ্যবাসী ধনপাল এইরূপ একজন ভিক্ষু। তিনি ৯৮০ সালে চীনে যান। ধর্মদেব নামক আর একজন ভারতবাসী তাঁহাকে সাহায্য করেন। ৯৯৫ সালে কলসন্তি, ৯৯৭ সালে রাহুল, ১০০৪ সালে শ্রমণ শীলভদ্র, ১০১৬ সালে বরেন্দ্র চীন-রাজসভায় গিয়া গ্রন্থানুবাদ করেন।

পুথিশালার ইতিহাসে জৈনদেরও কীর্তি বড় কম নয়। রাজপুতানা, গুজরাত, পাটন, জসল্মীর, সুরাট, কাম্বে, থরড, ভট্নের ও আমেদাবাদের উপাশ্রয়ে উৎকৃষ্ট পুথিশালা তাহাদের ছিল। এই সমস্ত পুথির সংগ্রহ মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখনও বর্তমান আছে। উপাশ্রয়গুলি বিহারের মত। ইহারা পুথিশালাকে ভারতী-ভাণ্ডার বা শুধু ভাণ্ডার বলেন। কোন কোন ভাণ্ডারে ১০,০০০এর বেশী পুথি আছে। গায়কোয়াড়ের রাজ্যের অন্তবর্তী পাটনের ভাণ্ডার ১১।১২ শতকে খুব বিখ্যাত ছিল। উপাশ্রয়ে যতিরা বাস করেন।

উপাশ্রয় যত পুরাতন, তাহার পুথিশালা তত মূল্যবান ও উপাদেয়। পাটনে ১২র বেশী উপাশ্রয় আছে। এটি চালুক্যদের সময়ে নির্মিত। ইহার পুথির সংখ্যাও খুব বেশী। পাটনভাণ্ডার অন্যান্য ভাণ্ডার অপেক্ষা বড়। কর্নেল টড (Col. Tod) হেমাচার্যের ভাণ্ডার আবিষ্কার করেন। লোকে ইহাকে পাটনভাণ্ডার বলে। এই সমস্ত ভাণ্ডার নগরশেঠ ও পঞ্চের কর্তৃত্বে রক্ষিত। এগুলির বর্তমান অবস্থা দেখিয়া অতীতের গৌরবময় অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে।

থরডের ভাণ্ডারগুলিতে জৈন সম্প্রদায়ের ইতিহাসগ্রন্থ ও বহু শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। জসল্মীরে পরেশনাথ মন্দিরের অধীনে পাটনে একটি সুন্দর ভাণ্ডার আছে। ধারার ভোজরাজের প্রাসাদে ১১শ শতকে একটি বৃহৎ পুথিশালা ছিল। সাহিত্যে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন পুথিশালার কথা উল্লিখিত নাই। সিদ্ধারিয় মালব বিজয়ের পর পুথিশালাটি অনিলবাড়ে লইয়া যান এবং চালুক্য-রাজকীয় পুথিশালার সঙ্গে মিশাইয়া দেন। এই পুথিশালাটি খুব প্রসিদ্ধ। চালুক্যরাজ বিশালদেবেরও (১২১২-১২৬২) ভারতীভাণ্ডার নামে একটি সুন্দর পুথিশালা ছিল।

আজও ভারতের নানাস্থানে রাজকীয় পুথিশালা আছে। রাজস্থান, আলোয়ার, জয়পুর, যোধপুর, বিকানের, জম্মু, মহীশূর, তাঞ্জোর, নেপাল প্রভৃতি গ্রন্থাগারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যোধপুর দরবার লাইব্রেরীতে ১৮০০ সংস্কৃত পুথি আছে, ছাপা বই, হিন্দী ও মারয়াড়ী পুথিও যথেষ্ট। দুষ্প্রাপ্য পুরাণ, তন্ত্র ও মাহাত্ম্যগ্রন্থের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। জসল্মীর গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য পুথি, কাব্য, হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা বড় কম নয়। দুষ্প্রাপ্য জৈনগ্রন্থও আছে। তালপাতায় লেখা ১২, ১৩ ও ১৪শ শতকে দুষ্প্রাপ্য হিন্দুশাস্ত্রের পুথি ৫০ খানির উপর আছে। বিকানের লাইব্রেরীতে ১৪০০ পুথি আছে। ভটনেরে সংস্থিত গ্রন্থাগারে প্রায় ৮০০ পুথি আছে। কাশ্মীরের রাজারা পুরানো পুথির বড়ই তারিফ করিতেন; অনেক অর্থ ব্যয়

করিয়া পুথিও সংগ্রহ করিতেন। নেপালের দরবার লাইব্রেরী এই সমস্ত লাইব্রেরীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন—ইহাতে প্রায় ৫০০ তাল-পাতার পুথি আছে। তাঞ্জোর লাইব্রেরী ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত—এটি সর্বাপেক্ষা বড়। অনেক দামী পুথি আছে।

মুসলমানরাও তাঁহাদের পুথিশালা নির্মাণ করিতেন। সুলতান জলালুদ্দীন খলজী রাজকীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুলতান অলাউদ্দীনের রাজত্বকালে নিজামুদ্দীন অউলিয়ার একটি পুথিশালা ছিল। ১৫শ শতকে বহমণি রাজ্যের মন্ত্রীর একটি পুথিশালা ছিল। এইটি বিদর শিক্ষাকেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত ছিল। ৩০০০ পুথিও ইহাতে ছিল। বহমণি রাজাদের অহমদনগরে আর একটি পুথিশালা ছিল। কবি ফেরিস্তা ইহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অদিল শাহনী রাজাদের বিজাপুরে পুথিশালা ছিল। বাবরের রাজত্বকালে অফগন গাজি খাঁর একটি পুস্তাকাগার ছিল। হুমায়ুন ও কামরান যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহাদের এই গ্রন্থাগার হইতে বই পাঠান হইত। হুমায়ুন দ্বিতীয় বার বাদশাহ হইবার পর তাঁহার প্রমোদভবন শেরমণ্ডলকে পুথিশালায় পরিণত করিয়াছিলেন। অক্বরের একটি বড় পুথিশালা ছিল। ইহাতে পুথিগুলি বিষয়-অনুসারে সাজান থাকিত।

প্রাচীন পুথি ও পুথিশালা সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন হিসাবে এই কয়টি কথা বলিলাম। প্রাচীন পুথির আলোচনার সঙ্গে অনেক কথাই আসিয়া পড়ে। পুথি কিসে লেখা হইত, কি দিয়া লেখা হইত; কি কালি দিয়া লেখা হইত ইত্যাদি। যত পুথি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, অধিকাংশ পুথিই দেশী কাগজে লেখা, কাগজে লিখিবার পর শাঁক বা ঝিনুক দিয়া ঘসিয়া মাজা। কতকগুলি পুথি সাদা কাশ্মীরী কাগজে লেখা। তালপাতা ও তেরেটপাতায় লেখা পুথিও কিছু কিছু পাওয়া যায়। দেশী কাগজগুলা এবড়ো-থেবড়ো—অমসৃণ। অনায়াসে জলদ লিখিবার

সুবিধার জন্য কাগজে কিছু মাখাইয়া সমান করিয়া লওয়া হয়। তেঁতুলবীচির কাই পুরু করিয়া লাগাইলে কাগজ বেশ চক্‌চকে হয়। সাধারণত কাগজে চালের মাড় লাগাইয়া এই কার্য করা হয়। তবে তাহাতে এক ভয় আছে। সহজে ঠাণ্ডা ও পোকা লাগিয়া যায়। এই সমস্ত কাগজে খুব পোকা ধরে। শঙ্খবিষ (white arsenic) মাখাইলে কিন্তু শীঘ্র পোকা লাগিবার ভয় থাকে না। ৮০-৯০ বছর আগে বিলাতী কাগজের চাকচিক্যে ভুলিয়াও তাহাতে পুথি লেখা হইয়াছে। John letter paper-এও পুথি লেখা হইয়াছে। বাজারে এক রকম হলদে তুলট কাগজ পাওয়া যায়, এগুলিও তেঁতুল দিয়া রঙ করা বটে, কিন্তু ইহাতে পোকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই।

কাগজে লেখা পুথি আমাদের দেশের আব-হাওয়ার গুণে পাঁচ ছয় শত বৎসরের বেশী টেঁকে না। সাহিত্য-পরিষদে ৬০০ বছরের পুরানো পুথি আছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কাশীধামে বাবু হরিশচন্দ্রের কাছে ১৩৬৭ সংবতের (১৩১০ ঈশাব্দের) লেখা ভাগবতের পুথি দেখিয়াছিলেন। এর চেয়ে পুরানো পুথি তিনি কোনও দেখেন নাই। আর কাগজে লেখা পুথি ভারতে আজ পর্যন্ত যত পাওয়া গিয়াছে, ১৩১০ ঈশাব্দের পুথিই প্রাচীনতম।*

পুথি লিখিবার পদ্ধতির একটা প্রাচীন সন্ধান ধারার রাজা ভোজের আমলে লেখা 'প্রশস্তি-প্রকাশিকা'য় পাওয়া যায়। চিঠি লিখিবার প্রণালী বর্ণনাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কাগজ কেমন করিয়া মুড়িতে হয়, বামদিকে কতখানি জায়গা ফাঁক রাখিতে হয়। বাম দিকের নীচের কোণে কতখানি কাটিতে হয়, সাম্‌নেটা সোনার পাত দিয়া কেমন করিয়া সাজাইতে হয়, পত্রের পিছন দিকে কেমন করিয়া অনেকগুলি শ্রী লিখিতে হয়—এই রকম কথা ইহাতে আছে। ব্যাস-সংহিতা অন্তত তুই হাজার বছরের পুরানো শাস্ত্র।

---

* Rajendralal Mitra : Notices, Xo, p. 111 (Report)

ইহাতে লেখা আছে, দলিলের প্রথম খসড়া একটা কাঠের ফলকের উপরে লেখা হইবে ; সুবিধা না হইলে মাটির উপর লেখা হইবে, তারপর ভুলভ্রান্তি শুধরাইয়া লিখিতব্য যাহা, তাহা পত্রস্থ করা হয়। কাত্যায়ন-স্মৃতিতে ইহার অনুবাদ আছে। কাত্যায়ন বলিতেছেন—

"পূর্বপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রাড়্বিবাকোঽভিলেখয়েৎ।
পাণ্ডুলেখেন ফলকে ততঃ পত্রং বিশোধয়েৎ॥"

এখানে পত্র মানে পাতা নয়। গাছের পাতা ২।৫ খানা নষ্ট হইলে কিছু আসিয়া যায় না। কাগজ দামী বলিয়া প্রথমে মাটিতে লিখিয়া ঠিক করিয়া, কাগজে শেষে লেখা হইত। ঈশাব্দ ১১শ শতকের পূর্বে ভারতে কাগজ ব্যবহারের নজির পাওয়া যায় না। ব্যাস-সংহিতা প্রভৃতির বচন প্রক্ষিপ্ত না হইলে কাগজের অস্তিত্ব বহু পূর্বেই স্বীকার করিতে হয়। চীনেরা অতি প্রাচীনকাল হইতে কাগজ তৈরি করিত। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে তিব্বতে কাগজে বই ছাপা হইত। তিব্বতী ও কাশ্মীরীরা চীন থেকে কাগজ লইত। হিন্দুদের তিব্বতী বা কাশ্মীরীদের কাছ থেকে কাগজ লওয়া অসম্ভবও নয়। ভূর্জপত্রে অতি প্রাচীনকালে লেখা হইত। কিন্তু তাহাতে পুথি লেখা হইত না ; ভূর্জপত্র সহজে নষ্ট হইয়া যায়—ইহাতে কবচাদি লিখিয়া ধারণ করা হইত।

তালপাতার চেয়ে তেরেট বেশী টেঁকসই। তালপাতে পুথি লিখিতে হইলে সেগুলি প্রথমে শুকাইয়া লওয়া হয়, তারপর সিদ্ধ করা হয় অথবা কিছুকাল জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। পরে আবার শুকাইয়া লইয়া পুথির আকারে ভাল করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। অতঃপর তেলা পাথর বা শাঁক দিয়া মাজিয়া লইয়া পুথির কার্যে ব্যবহার করা হয়।

সকল সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে সাহিত্যে তাহাদেরই নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মানুষের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার মৃত্যু পর্যন্ত কত সমস্যাই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, চিন্তাশীল মনীষিগণ সেই সকল সমস্যা-সিদ্ধান্তের যে-ভাবে সমাধান করিয়াছেন, সকল সময়ের মধ্য দিয়া সাহিত্য সেগুলি বহন করিয়া আনিয়াছে। জগতে পরিবর্তনকে কেহ বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। অবশ্যম্ভাবী এই পরিবর্তনের ভূয়িষ্ঠ চিত্র সাহিত্যে স্বতঃপ্রকটিত।

আবার ধর্ম ও সংস্কৃতি বাগর্থের ন্যায় নিত্য-সম্বন্ধ। তাই আমাদের দেশে সংস্কৃতির বাহন সাহিত্য ধর্মকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই গঠনযুগে ধর্মই সাহিত্যের প্রাণ ছিল। এইরূপ হইবার কয়েকটি কারণের মধ্যে প্রধান একটি কারণ ছিল এই যে, প্রাচীন ভারতে লেখাপড়া ও সংস্কৃতি কোনদিন এক বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই ; নিরক্ষরতাও তাচ্ছিল্যের সূচনা করে নাই ; সংস্কৃতি ছিল একটি অন্তরের বস্তু এবং অক্ষর পরিচয় তাহার জ্ঞাপক মাত্র ছিল। মহত্তম-দিগের সাধনার আলোক জনসাধারণের মনে প্রবেশ করিত। অক্ষরজ্ঞান পুস্তক অবলম্বন করিয়া সে আলোক বিস্তার করে নাই। ব্রহ্মচারী দীর্ঘকাল যাজন করিয়া তাহার মস্তিষ্কে সংগ্রহ করিয়াছে গুরুর সাধনার ফল। তাই প্রাচীন ভারতে এক অপূর্ব সূত্রসাহিত্যের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ততম আকারে শ্রেষ্ঠতম সাধনার ফল ইহাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ভারতীয় সর্ব-শাস্ত্রেরই এই রীতি। সভ্যতার বাণী ছিল স্মৃতি ও শ্রুতি। ভারতবর্ষে বিদ্যা কখনও মাত্র একাডেমিক ব্যাপার হয় নাই।

[illegible]বস্তা হইয়াছে অন্তরের বস্তু। [illegible]
জ্ঞাপক মাত্র হয় নাই—তাহা মানুষের প্রাণস্বরূপ হইয়াছে ; [illegible]
দর্শন ও ধর্ম কখনও এইদেশে দুইটি পৃথক্ বিষয় বলিয়া বিবেচিত
হয নাই ; ধর্মেব গোড়াব কথা হইয়াছে সর্ববস্তুর মধ্যে একটি অখণ্ড
পূর্ণের প্রকাশ মাত্র। আবাব সর্ববিদ্যাই ধর্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত
হইযাছে। চতুঃষষ্টি শিল্পকলাও ধর্মেব বাহন হইয়াছে ; তাই শিল্প-
কলাব পুস্তকেব নামও শাস্ত্র। *ধর্মেব ন্যায় ব্যাপক শব্দও ভাবতীয়*
ভাষায আব নাই। ধর্ম সকলকে অঙ্গাঙ্গিভাবে ব্যাপৃত কবিযা
বাখিযাছে বলিযা এদেশে কোন বিদ্যা কোন water-tight com-
partment-এব মত হয নাই , তাহাদেব মধ্যে কোন বিবোধ ঘটে
নাই। সববিদ্যাব শেষ কথা হইযাছে ধর্ম। সে যুগে তাই ধর্ম
ভিন্ন এদেশে কোন কাব্য হয নাই, স্থাপত্য হয নাই, শিল্প-সৃষ্টি
হয নাই। আমাদেব শিল্পে বিদেশীবা তাই বস্তুতন্ত্রেব অভাববোধ
কবেন , বাস্তবেব সঙ্গে আমাদেব শিল্পেব সামঞ্জস্য লক্ষিত হয
না। তাহাব কাবণ—প্রাচীন ভাবতেব সাধনা concrete-এব
মধ্য দিযা abstract-এব, রূপেব মধ্য দিযা অপরূপেব। লিঙ্গ-
পূজায আমবা ইহাবই সাক্ষ্য পাই। মূর্তিপূজায যে অবিকল মনুষ্য-
মূর্তি দেখি না, তাহাবও ব্যাখ্যা এই। এখানে abstract-কে মূর্তি
দিবাব প্রচেষ্টা হইযাছে—তাহা concrete-এব হুবহু নকল হইতে
পাবে না। এই ত গেল একদিকেব কথা। ধর্ম সম্বন্ধেও কিছু
বলিবাব আছে। যাহা সত্য—তাহাই ধর্ম। জীবন-যাপনেব স্থাযী
অনুশাসনই ধর্ম। ইহকালে পবকালে সুখ শান্তি আনন্দ লাভ
কবিবাব জন্য শান্ত ও নির্ভীক চিত্তে দেহত্যাগ কবিবাব শক্তিলাভ
কবিবাব জন্য মানুষ ধর্মানুষ্ঠান কবিযা থাকে। এইরূপ কবিতে গিযা
মানুষ দার্শনিকতত্ত্বসমূহকে জীবনে চালাইতে চায। জীবনে সেগুলিকে
চালাইবাব dynamic কবিবাব যে প্রযত্ন বা প্রচেষ্টা তাহাই ধর্ম।

এত বড পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা বড কম নয। কত জাতিব

সহিত কত ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার কালে লোপ পাইয়াছে। এক জাতি অন্য জাতির সংঘর্ষে আসিয়া যখনই সে আপনার হীনতা বা ভ্রম উপলব্ধি করিয়াছে, তখনই সে অপর জাতির মহত্ত্ব বরণ করিয়া লইয়াছে। মানুষের ন্যায় ধর্মেরও শত্রু আছে। সাধারণত আমরা ধর্মবিশেষের ; ধর্মমাত্রেরই দুইটি শত্রু দেখিতে পাই। একটি —কোন প্রবল বিরোধী ধর্ম আর একটি জ্ঞানবৃদ্ধি এবং জ্ঞানবিস্তার। বিরোধী প্রবল ধর্মের নিকট হীনবল কতবার যে মাথা নত করিয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষী। আবার পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া এইরূপও দেখা গিয়াছে যে যখনই যেদেশে জ্ঞানের সঞ্চয় ও জ্ঞানের প্রচার বিস্তৃতভাবে হইয়াছে তখনই সে দেশে কোন না কোন আকারে ধর্মবিপ্লব ঘটিয়াছে—ধর্মসম্বন্ধীয় প্রচলিত মত ও বিশ্বাস কোথাও অল্পাধিক পরিবর্তিত, কোথাও বা একেবারে ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানপ্রচার চিরকালই মিথ্যার শত্রু। যেখানে জ্ঞানের বিস্তৃতি সেখানে মিথ্যা টিকিতে পারে না। কাজেই জ্ঞান-প্রচার ভ্রমপূর্ণ অপধর্ম মাত্রেরই চক্ষুঃশূল। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যাঁহারা অপধর্ম যাজন করেন, তাঁহারা চিরকাল জ্ঞানবৃদ্ধি ও জ্ঞানপ্রচারের প্রতিকূল। প্রতিকূল জ্ঞানপ্রচারে যাহাদের আতঙ্ক হয় তাহাদের ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত নয়—সে ধর্ম উপধর্ম বা অপধর্ম। মানুষকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে কতদিন বঞ্চিত রাখা যায়? একদিন তাহার ভুল ভাঙিয়া যাইবে। সে যে স্বাধীন চিন্তাকে ভয় করিত, আস্তে আস্তে তাহাই তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, সে দিন সে আর অপধর্মে বিশ্বাস রাখিতে পারিবে না।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিন্তু এ সকল কথা খাটে না। বেদানুসারে এই ধর্মের দুই প্রকার শত্রুরই অভাব। এমন ধর্ম পৃথিবীতে প্রচলিত নাই, যাহা হিন্দুধর্মের যথাযোগ্য ও প্রবল শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বৈদিকধারানুবর্তী এই ধর্ম শতসংস্করণে সংস্কৃত, শতসংঘর্ষে দৃঢ়ীকৃত, শতবিচারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং শতপরীক্ষায়

পরীক্ষিত। জগতের কোন ধর্মই এমন ধ্যান-প্রসূত শতধৌত মার্জিত নয়।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে, কালগত প্রয়োজনের সঙ্গে পর পর যুগে এই ধর্ম বহু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য, সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে প্রাচীন বৈদিক ধারা অক্ষুণ্ণই রহিয়া গিয়াছে। বেদসম্মত ক্রমের অনুকূলে ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত থাকায় বৈদিক ধর্ম হইতে পরবর্তী ধর্মের বিচ্ছেদ ঘটিবার অবকাশ হয় নাই। পরবর্তী যুগের ধর্ম—শৈব, শক্তি, তান্ত্রিক, জৈন, বৌদ্ধ, বজ্রযানী, সহজ, নাথপন্থী প্রভৃতি বহুমতের সংস্পর্শে আসিয়াও বৈদিকধারা সতত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল এবং অনবরত তাহাতে সুস্নাত হইয়া 'সনাতন ধর্ম' নামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের দেশের তান্ত্রিক ধর্মও এই ধর্মানুষ্ঠানের পরিণতিবিশেষ। তন্ত্রমত নানাভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ইহার উৎপত্তিকাল নির্ণয় করিবার মত উপাদান আমাদের নাই। তার তত্ত্ব অতি গুহ্য। নিতান্ত গুহ্যভাবে ইহার তত্ত্বগুলি দেশ কাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকারে গুরু-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল। এমনই করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে আদান-প্রদান ঘটিয়াছিল।

বৌদ্ধগণের মতে বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গ বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক ক্রীড়া প্রবর্তন করেন। বসুবন্ধুর সময় ২৮০ খ্রীঃ—৩৬০ খ্রীঃ। সুতরাং বলিতে হয় অসঙ্গ চতুর্থ শতকের প্রথমপাদে বর্তমান ছিলেন। তিব্বতের ঐতিহাসিক তারনাথও বলিয়াছেন, অসঙ্গ হইতে ধর্মকীর্তি পর্যন্ত গুরু-পরম্পরায় আমরা 'চক্রসম্বর তন্ত্র' নামক সুপ্রসিদ্ধ 'তান্ত্রিক গ্রন্থে গুরু-পর্যায়ে যাঁহাকে প্রথমেই পাই তাহার নাম—'সরহ'। তারনাথ এবং Pag-Sam-Jon-Zanএর লেখক উভয়েই এই সরহকে মন্ত্রের সর্বপ্রাচীন প্রচারকগণের অন্যতম বলিয়াছেন। তারনাথ বলেন,

'সরহ' বুদ্ধকপালতন্ত্র প্রবর্তন করেন। তারনাথের গুরু-পরম্পরার তালিকায় গুরুপর্যায়ে প্রথম সরহ, ক্রমে লুইপা, পদ্মবজ্র ও কৃষ্ণাচার্যের নাম আছে। সরহ যে বাঙালী ছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তারনাথ ও Pag-Sam-Jon-Zanএর লেখক উভয়েই যে বিবরণ দিয়াছেন তদনুসারে সরহের পূর্বনাম ছিল রাহুল-ভদ্র। এছাড়া তিনি আচার্য, মহাচার্য, সিদ্ধ, যোগী, মহাযোগী, যোগীশ্বর, মহাব্রাহ্মণ, মহেশ্বর প্রভৃতি উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন। পূর্বদেশে রাজ্ঞী নামক নগরীতে এক ব্রাহ্মণ ও এক ডাকিনী হইতে ইঁহার জন্ম। প্রাচ্যরাজ চন্দনপালের সময়ে ইনি আবির্ভূত হন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে ইনি পারদর্শী ছিলেন। রাহুলভদ্র রাজা রত্নফল ও তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রীকে অলৌকিক দক্ষতা দেখাইয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। তারপর তিনি নালন্দায় প্রধান আচার্য হন। উড়িষ্যার কোবেস কল্প নামক এক যোগীর নিকট তিনি মন্ত্রযান শিক্ষা করেন। অতঃপর মহারাষ্ট্রে গিয়া একজন সন্ন্যাসিনীর যোগে মহামুদ্রা সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধ অবস্থায় তাঁহার নাম হয়—'সরহ'। সংস্কৃতে রচিত তাঁহার বহুগ্রন্থ তিব্বতীয় Tangyur-এ রক্ষিত আছে। এই সরহ ছিলেন ধর্মকীর্তির সমসাময়িক—৬০০-৬৫০ খ্রীঃ।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সরহ-রচিত চারিটি চর্যাগীতি পাইয়াছেন। সেই চারিটি গীতিতে ২৪টি সংস্কৃত শব্দ আছে তাহাদের সকলগুলিই আজও বাঙলায় চলিতেছে। সংস্কৃত হইতে ব্যুৎপন্ন ৩৫টি শব্দ আছে—এগুলি একটু আধটু বানান বদলাইলে সংস্কৃত হইয়া যায়। ৯৫টি পুরানো বাঙলা কথা আছে এবং ২৮টি চলিত বাঙলা শব্দ আছে। সরহের একটি পদ—

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা॥
অম্হে ন জাণঁহু অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥

জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো॥
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কংখা।

নেপালে প্রাপ্ত উপাদান হইতে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, সরহ অন্যূন ৬৩৩খ্রীঃ বিদ্যমান ছিলেন। সরহ শুধু পদরচনা করেন নাই, তিনি ছিলেন বজ্রযান তন্ত্রের প্রধান সাধক ও একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। একথাও বলিতে পারা যায় যে তাঁহার সময় হইতেই বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনা সমগ্র ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে। তিব্বতীয় Tangyur হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ২১ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সরহকে প্রথম বাঙলা পদরচয়িতা বা বাঙলা সাহিত্যে পদাবলী রচনার প্রথা প্রবর্তক।

ইহার পর আমরা পাই শবরীপাদের বাঙলা পদ—ইনি সরহশিষ্য নাগার্জুনের শিষ্য। শবরীর সময় ৬৫৭ খ্রীঃ। Pag-Sam-Jon-Zan-এ ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। শবরীর পদও বজ্রযানের ব্যাখ্যায় আছে।

এখন দেখা যাইতেছে, আমরা খ্রীষ্টের সপ্তম শতকে প্রারম্ভ হইতেই অর্থাৎ প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্বে বাঙলা সাহিত্যের তথা ভাষার নিদর্শন পাইতেছি। এই পদগুলি বজ্রযানীদের প্রহেলিকা তান্ত্রিক গান। ইহাদের সাধারণ অর্থ খুব সরল, কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থ অতি গূঢ়।

ইহার পরবর্তী সাহিত্যের নিদর্শনও আমাদের আছে। সে সকলের কথা আমি বলিব না। ১৪০০ সালের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনাদিতে ভাষায় পরিণতির পরিচয় আছে। তারপর শ্রীচৈতন্যের সময় হইতে রীতিমত বাঙলা সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু ১৪০০ সালের পূর্ববর্তী বাঙলা-সাহিত্যের কথা শুনাইবার, উপকরণের আমাদের

নিতান্ত অভাব। তবে সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা হইতে যাহা কিছু নির্ণয় করা যায়।

সেই সময়ে অথবা তৎপূর্বে যে বাঙলা সাহিত্যে—অন্য কিছু বা কোন কিছু রচনা হয় নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত আমরা করিতে পারি না। ইহার পূর্বেকার নিদর্শনের অভাবের দুইটি কারণ থাকিতে পারে—প্রথমত তেরেট, তালপাতা প্রভৃতির পুথিতে অথবা গাছের ছালে বা অনুরূপ পদার্থে প্রাচীন পুথি লেখা হইত। সেইগুলি অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে দেবভাষা বলিয়া অধিকাংশ রচনাই সংস্কৃত ভাষায় হইত এবং সেই ভাষাই আদৃত হইত। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব হিসাবেও রচনা রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীনযুগে সকল গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ই সংস্কৃতে রচিত হইত। ইহাতে ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব বাড়িত। প্রাচীন-কালে ভারতীয় সকল জাতির লক্ষ্যই এই সংস্কৃতের উপর পড়িয়া-ছিল। ইতিহাসের দিক দিয়া বলিতে গেলে—বুদ্ধদেবই লৌকিক ভাষার গুরুত্ব দান করেন। ঠিক সেইরূপ বাঙালী ব্রহ্মাচার্যগণ বাঙলায় বা তাহাদের মাতৃভাষায় পদরচনা করিয়া বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন; তাই তাঁহাদের পদগুলি আজিও সাদরে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার পর তাঁহাদের বা বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব হ্রাস পায়, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে সংস্কৃতেরই জয় হয়। সুতরাং বাঙলা-সাহিত্য-ভাণ্ডারে ১৪০০ সালের পূর্বে কিছুই সঞ্চিত হয় নাই বা রক্ষিত হয় নাই। এই যুগ বাঙলার একটা বিরাট বিপ্লবের—রাজনৈতিক পরিবর্তনের যুগ। মুসলমান-বিজয়ের কিছুকাল পরে বাঙলায় শান্তিপ্রতিষ্ঠা হয়, আর সেই যুগের নিদর্শন পাই—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের—প্রেমলীলা-বিষয়ক গানে, রামায়ণ মহাভারতাদি অনুবাদ, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বা তদানীন্তনকালীন রচনায়—গোপীচাঁদের গান, পদ্মাপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রভৃতিতে।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন রূপ পাই—সরহের পদে।

ইহার ভাষা-বিচারে ইহাতে মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অপভ্রংশের ক্রমরূপান্তরিত একটি রূপ পাওয়া যায়। ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে বলা যায়, খ্রীঃ-পূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে মৌর্যবিজয়ের সময় হইতে বাঙলায় আর্যভাষার প্রভাব ও প্রসার হয়। সেই মাগধী-প্রাকৃতের বিকারে বা ক্রমবিকাশেই বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন। কিন্তু কিরূপে মাগধী-প্রাকৃত মাগধী-অপভ্রংশের ক্রমপরিবর্তনে বাঙলা ভাষায় উৎপত্তি হইল, তাহা বলা অসম্ভব। ভাষার উৎপত্তিকে কোন সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা যায় না। আদিম বাঙালী জাতির ভাষা যে কিরূপ ছিল, আর মাগধী প্রাকৃতের সহিত তাহার কিরূপ পার্থক্য ছিল—পরে উভয়ে মিশ্রিত হইয়া কিরূপে বর্তমান পরিণতিতে আসিয়াছে, তাহার ধারাবাহিক আলোচনা ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে অসম্ভব। তবে আর্যপ্রভাব-বিস্তৃতির কয়েক শত বর্ষ পরেকার নিদর্শন পাই—এই সমস্ত বজ্রযানীদের পদে।